দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৭ বর্ষ, ১২ সংখ্যা || ১৭ নভেম্বর - ২০১৪ || ৩০ কার্তিক - ১৪২১ || website : www.eswastika.com

একবিংশ শতাব্দীর রক্তচক্ষু

মাদ্রাসা

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত।।

৬৭ বর্ষ ১২ সংখ্যা, ৩০ কার্তিক, ১৪২১ বঙ্গাব্দ

১৭ নভেম্বর - ২০১৪, যুগাব্দ - ৫১১৬,

Website : www.eswastika.com

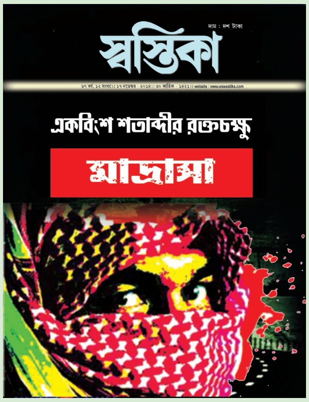

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬, ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৮

খোলা চিঠি : সাপে-নেউলে জোট

বুনো ওলের পাশে বাঘা তেঁতুল ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৯

পশ্চিমবঙ্গে এখন হবুচন্দ্র গবুচন্দ্রের রাজত্ব চলছে ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

'আচ্ছে দিন' আসছে কি? ▯ দিব্যজ্যোতি চৌধুরী ▯ ১১

মাদ্রাসার আড়ালে ব্যাপক জঙ্গি কার্যকলাপ ▯ জিতেন মিস্ত্রি ▯ ১৩

রাষ্ট্র, মানবতা ও ধর্মীয় সহাবস্থান-বিরোধী ক্রিয়াকলাপে অনুমোদনহীন মাদ্রাসাগুলি নিষিদ্ধ হোক ▯ একলব্য রায় ▯ ১৬

নেড়াদেউলের কামেশ্বর মন্দির ▯ ড. প্রণব রায় ▯ ২১

জীবনানন্দ-জননী কুসুমকুমারী দাশ ▯ রূপশ্রী দত্ত ▯ ২২

দুঃখের তিমিরে জ্বলে ওঠা মঙ্গল আলোক ▯ চতুর্থ পাণ্ডব ▯ ২৩

ফিরে দেখা — কংগ্রেসে পরিবারতন্ত্রের জন্মকথা ▯ ইন্দর মালহোত্রা ▯ ২৭

বাংলাদেশে বি এন পি শিবিরের জনবিচ্ছিন্নতা বেড়েই চলেছে ▯ দিলীপ চট্টোপাধ্যায় ▯ ২৯

'সাইবার স্পাইং' : আধুনিক যুদ্ধের নতুন কৌশল ▯ দেবাশিস আইয়ার ▯ ৩৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ ▯ অঙ্গনা : ২৬ ▯ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৫ ▯ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৭ ▯ রঙ্গম : ৩৯ ▯ শব্দরূপ : ৪০ ▯ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

প্রকাশিত হবে
২৪ নভেম্বর
২০১৪

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২৪ নভেম্বর
২০১৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

মুর্শিদাবাদ কি রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে?

মুর্শিদাবাদ জেলাটিকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা আজকের নয়, স্বাধীনতার বহু পূর্ব থেকেই — সে প্রচেষ্টা চলছে। ১৯৩৭ সালে বহরমপুরে এসে স্বয়ং জিন্না মুসলমানদের এই ভাবনায় চালিত করেছিলেন। সেই কৌশলে মুর্শিদাবাদ আজ হিন্দুশূন্য হতে চলেছে। রাজনৈতিক নেতারা যখন সাপ-লুডোর গুটি চালাচালিতে ব্যস্ত, তখন মুর্শিদাবাদকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে জঙ্গিরা সক্রিয়। এই মুহূর্তে হাজারো লোকের ভিড়ে গা-ঢাকা দিয়ে মুর্শিদাবাদে রয়েছে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের নেতারা। কারণ লক্ষ্য— মুর্শিদাবাদ। আগামী সংখ্যায় এই নিয়েই বিশেষ বিষয়।
লিখেছেন **নবকুমার ভট্টাচার্য।**

HB ®
INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS
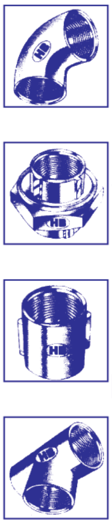
HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.
Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ ®
শাহী
গরম
মশলা

SUNRISE PURE ®
রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

নৈরাজ্যের রাজ্য

পশ্চিমবঙ্গে এখন ত্র্যহস্পর্শ চলিতেছে। চারিদিকে কেবল 'উন্নয়ন উন্নয়ন' বলিয়া সরকারি উদ্যোগে জপনাম চলিলেও উন্নয়নের কোনো লক্ষণ চোখে পড়িতেছে না। সরকারি মঞ্চে উন্নয়নের নানা ডঙ্কা বাজিলেও এই সরকারের উন্নয়ন করিবার কোনো আগ্রহ নাই, দায় নাই, দায়িত্বও নাই। বরঞ্চ বলা যাইতে পারে যোগ্যতাও নাই। চারিধারে নৈরাজ্য বিরাজ করিতেছে। বামফ্রন্ট আমলে এই ব্যাধি মজ্জাগত হয়। দলের ক্ষমতা কায়েম হইবার পর তৃণমূল রাজত্বেও নৈরাজ্য চলিতেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যের সাম্প্রতিক উদাহরণ হইতেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক সমাবর্তন অনুষ্ঠান উপলক্ষে সম্মানপ্রাপক, অতিথি এবং সভাপতিত্ব করিবার আহ্বান একের পর এক স্বনামধন্য ব্যক্তিরা যে ভাবে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন তাহা রাজ্যের পক্ষে অগৌরবের। বিদ্যালয় হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে আজ নৈরাজ্যের বাতাবরণ। সরস্বতীকে বিদ্যাস্থান হইতে বিসর্জন দিয়া দলীয় নেতানেত্রীর আবাহন শিক্ষাক্ষেত্রকে কলুষিত করিয়াছে বহুকাল। অতি সম্প্রতি সামাজিক নৈরাজ্যের চরম নিদর্শন হইল প্রকাশ্য দিবালোকে ছাত্রছাত্রীদের চুম্বন প্রদর্শন। ভারতীয় দর্শনে ধর্ম অর্থের সহিত কামকেও পুরুষার্থ বলিয়া শ্রদ্ধা করা হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা বলিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে বদ্ধ দেওয়ালের কার্যাবলীকে রাস্তায় প্রদর্শন ভদ্রজনোচিত নয়। মনুষ্যেতর প্রাণীর সহিত মানুষের তফাত এইখানেই। শিক্ষার যে সত্যিই অধঃপতন ঘটিয়াছে ইহাই তাহার সাক্ষাৎ উদাহরণ। রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রেও নৈরাজ্য চলিতেছে। বঙ্গভূমি রক্তস্নাত। রাজ্যে পরিবর্তনের পরে সুশাসনের প্রক্রিয়াটিরও পরিবর্তন জরুরি ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা তাহা হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গে পূর্বতন বাম জামানায় গ্রামবাংলায় যে গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হইয়াছিল আজ তাহারই পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। পতাকার রঙ বদল হইয়াছে মাত্র, শাসকের চরিত্র বদল হয় নাই এবং পুলিশ যথারীতি শাসকের পদতলে বন্দনারত। বাম জামানায় আমজনতার জীবন কীভাবে পীড়িত হইয়াছিল সেই স্মৃতি এখনও জনমন হইতে মুছিয়া যায় নাই। আজ শাসক পরিবর্তনের পরেও যদি সেই ইতিহাস পুনরায় ফিরিয়া আসে, তখন মানুষের পক্ষে প্রমাদ গোনা স্বাভাবিক। দুর্ভাগ্যজনক হইলেও সত্য, সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা সেই স্মৃতিকেই পুনর্বার জাগ্রত করিতেছে। আসলে নেতা-নেত্রীর ব্যক্তিগত জীবনে সততা রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হইলেও সঠিক নীতি, ভাবাদর্শ, দৃঢ়তা না থাকিলে নৈরাজ্য তৈরি হয়। অসৎ পথে ক্ষমতা আঁকড়াইয়া থাকিবার জন্য বামপন্থীদের আমলে আরামবাগ, কেশপুর, নন্দীগ্রাম হইয়াছে এখন পাড়ুই, মাকড়া, ভাঙড় হইতেছে। সঙ্গে যোগ হইয়াছে খাগড়াগড়। তাহা হইলে এই সততার বিজ্ঞাপন কিসের জন্য? কুণাল জেলে, রজত জেলে, অন্যরা জেলে যাইবার অপেক্ষায়। তাহা হইলে আমি সৎ হইলাম কোন উপায়ে! বাঙালি সমাজকে নৈরাজ্যের পথে ঠেলিয়া দিয়া আজ মুসলমান মোল্লাদের উন্নয়ন করিতেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সংবিধানের নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া সরকারি কোষাগার হইতে টাকা দান চলিতেছে। এই টাকায় ধর্মীয় শিক্ষার অন্তরালে চলিতেছে অস্ত্রশিক্ষা। রাজ্যের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি গত চৌত্রিশ বছরের মতোই একই খাতে প্রবাহিত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অশান্তি ও অনিশ্চয়তার সুড়ঙ্গ হইতে রাজ্যবাসীকে মুক্ত করিতে পারেন নাই। শিল্পের অবস্থাও দূরঅস্ত। টাকা নাই, পয়সা নাই। এমন এক ঋণগ্রস্ত রাজ্যে শিল্পও নাই, যুবকদের চাকরিও নাই। কোথাও পরিণতমনস্কতা বা বাস্তব বুদ্ধির ছাপও নাই। এই নৈরাজ্য হইতে মুক্তির আশায় বাঙালি নরেন্দ্র মোদীকে স্বাগত জানাইতে প্রস্তুত। বাঙালির আশা, একমাত্র নরেন্দ্র মোদী এবং তাহার দল বিজেপি এই নৈরাজ্য মুক্ত করিবার জন্য যোগ্য।

সুভাষিত

অয়ং নিজঃ পরো বেত্তি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদার চরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।।

আপন-পর ভাবনা সঙ্কুচিত মনোভাবসম্পন্ন লোকেরাই করে থাকেন। উদার চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তি সারা পৃথিবীকেই এক পরিবার মনে করেন।

হাবড়ার কালীপূজায় দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব

সংবাদদাতা॥ গত ২৩ অক্টোবর দীপাবলির সন্ধ্যায় উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়া থানার অন্তর্গত কাশীপুর উত্তরপাড়া (মালি পাড়া) গ্রামের কল্পতরু পূজা কমিটির সদস্যরা শোভাযাত্রা সহকারে পূজার জন্য মা কালীর মূর্তি নিয়ে পূজামণ্ডপে যাচ্ছিল। সেই সময় কাশীপুর বাজারের গৌড়বঙ্গ রোডের প্রতীক্ষালয়ের সামনে স্থানীয় মুসলমান পাড়ার নাসিরুদ্দিন মণ্ডল শোভাযাত্রার মধ্যে ঢুকে মহিলাদের সঙ্গে অভব্য ও অশালীন আচরণ করতে শুরু করে। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী হিন্দুরা এই অসভ্যতার বিরোধিতা করলে নাসিরুদ্দিন মুসলমান যুবকদের সঙ্গে করে নিয়ে এসে শোভাযাত্রার মধ্যে ঢুকে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতিকে গালিগালাজ করে মা কালীর মূর্তি ভেঙে দেয় এবং শোভাযাত্রায় উপস্থিত হিন্দুদের মারধর এবং মহিলাদের সম্মানহানি করে। কিছুক্ষণের মধ্যে নাসিরের নেতৃত্বে আরও বেশি সংখ্যায় সশস্ত্র ও দলবদ্ধ মুসলমান দুষ্কৃতী হিন্দু পাড়ায় প্রবেশ করে তাণ্ডব চালায়। দুষ্কৃতীরা যখন জনৈকা গৃহবধূর সম্ভ্রম নষ্ট করে তখন তাকে বাঁচাতে গিয়ে তার প্রতিবেশী বিভাস রাজভর, সুকুমার বিশ্বাস ও অনুপ দাস তাদের হাতে ভয়ানকভাবে প্রহৃত হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় এদের হাবড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনার কথা স্থানীয় থানায় জানানো হলে তারা প্রাথমিক পর্যায়ে অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে এবং তৎক্ষণাৎ হিন্দুদের গতিবিধির উপর অন্যায্য নিয়ন্ত্রণ আনে। এর ফলে গ্রামের হিন্দুরা সঠিকভাবে মাতৃপূজার ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বঞ্চিত হয় এবং এলাকার হিন্দুদের দীপাবলির আনন্দ বিষাদে রূপান্তরিত হয়।

আশ্চর্যজনকভাবে, পরদিন সকালেই অর্থাৎ ২৪ অক্টোবর রাজনৈতিক নেতাদের মদতে বলীয়ান হয়ে কাশীপুর জামে মসজিদ কমিটির পক্ষে জনাব আলি বিশ্বাস হাবড়া থানায় বিধান বিশ্বাস, দেবেশ বিশ্বাস, পরিমল মণ্ডল, মিঠুন ব্যাপারী, হরি বিশ্বাস, মনোজ বিশ্বাস, আশিস পাণ্ডে, সত্য রায়, প্রবীর পাল ও হেমন্ত বিশ্বাসের নামে একটি মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে, তারা রাতে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মসজিদ ভাঙচুর করে এবং মসজিদের আসবাবপত্রের ক্ষতি করে। সর্বোপরি তারা নাকি কোরান মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তাছাড়াও তারা গ্রামের কিছু বাড়িতে ভাঙচুর চালায়। এই অভিযোগের ভিত্তিতে হাবড়া থানার পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৪৭, ৪২৭, ৩৭৯ (এফ. আই. আর. নং- ৮৩৭/১৪, হাবড়া থানা)-সহ ছয়টি ধারা এদের বিরুদ্ধে দিয়ে গ্রামেরই যুবক বিধান মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে। আশ্চর্যের বিষয়, জনাব আলির দায়ের করা অভিযোগে বিধান মণ্ডলের নাম পর্যন্ত ছিল না। এই বিধান মণ্ডলের একমাত্র অপরাধ ছিল রাতে দুষ্কৃতীদের আক্রমণ প্রতিহত করতে নিজের জীবন বিপন্ন করে হিন্দুদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

এরপর ২৫ অক্টোবর ওই বিভাস রাজভর হাসপাতালে কিছুটা সুস্থ হয়ে ডাকযোগে একটি অভিযোগপত্র হাবড়া থানায় পাঠান (এফ. আই. আর. নং ৮৩৯/১৪, হাবড়া থানা)। ওই অভিযোগপত্রে নাসিরুদ্দিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় এবং প্রবল জনমতের চাপে পুলিশ নাসিরুদ্দিনকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ নাসিরুদ্দিনের সঙ্গীরা ক্ষমতাসীন নেতৃত্বের মদতে এবং পুলিশ প্রশাসনের পক্ষপাতদুষ্ট বদান্যতায় আজও এলাকায় সন্ত্রাস তৈরি করে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে আর অসহায় হিন্দুরা নিরাপত্তার আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন।

অভিযোগ, স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক ও রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক এবং বারাসতের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে মুসলমান অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। সূত্রে খবর, সাংসদ কাকলি দেবী নাকি কাশীপুর জামে মসজিদ কমিটিকে মসজিদের ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫ লক্ষ টাকা দিয়ে আসেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে, আরও টাকার প্রয়োজন হলে তিনি দেবেন।

.অভিজ্ঞ মহলের মতে, এই টাকা ঠিক কোন কাজে ব্যবহৃত হবে তা নিয়ে সন্দেহ আছে। প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা ও বিরূপ ব্যবস্থার কারণে গ্রামের হিন্দুরা অনেকেই গ্রামছাড়া এবং যাঁরা গ্রামে আছেন তারাও আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। নিজেদের ধর্ম পালন আজ মুসলমানদের দয়ার উপর নির্ভর করছে বলে স্থানীয় হিন্দুরা অভিযোগ করেছেন। ■

সবার প্রিয়
®
বিল্লদা
চানাচুর
'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

উত্তরবঙ্গে অনুমোদনহীন মাদ্রাসার সংখ্যা দ্রুত বেড়েছে

সংবাদদাতা : মালদা ॥ সম্প্রতি বর্ধমান বিস্ফোরণ কাণ্ডের পর এই রাজ্যের বিভিন্ন অনুমোদনহীন মাদ্রাসায় বাংলাদেশের জামাত- উল-মুজাহিদিনের (জুম) প্রশিক্ষণ শিবির চলার খবরে গোয়েন্দা দপ্তর নড়েচড়ে বসেছে। গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হয় এই অনুমোদনহীন মাদ্রাসাগুলিতে জেহাদিরা জঙ্গি ডেরা বানিয়ে ফেলেছিল। আশ্চর্যজনক ভাবে গত ৬ নভেম্বর 'কলম' সংবাদপত্রে জেহাদ-এর অর্থ 'গঠনমূলক কাজ' বলে উল্লেখ করেছেন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মওলানা মাহমুদ আসাদ মাদানি। তিনি বলেছেন, জেহাদ-এর নাকি অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে। অথচ এন আই এ বলছে বর্ধমান বিস্ফোরণ কাণ্ডে শিমুলিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ইউসুফের সঙ্গে জেহাদি ভাষণের একটি সিডি উদ্ধার হয়েছে। সমগ্র উত্তরবঙ্গের সীমান্ত এলাকায় অনুমোদনহীন মাদ্রাসার সংখ্যা গত তিন চার বছরে দ্রুত বেড়ে চলেছে। মালদা, দুই দিনাজপুর-সহ কোচবিহারে অনুমোদনহীন মাদ্রাসা সীমান্তের দু-তিন কিলোমিটারের মধ্যে রাতারাতি গজিয়ে উঠেছে। অভিযোগ, সীমান্তের প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে অনুমোদনহীন মাদ্রাসার সংখ্যা বেড়ে চললেও এগুলির ওপর জেলা প্রশাসনের কার্যত কোনো নজরদারি থাকে না। মালদা জেলার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কালিয়াচক, গোলাপগঞ্জ, বৈষ্ণবনগর ও ইংলিশ বাজারের গ্রামগুলিতে বিশাল বিশাল ঝাঁ চকচকে অনুমোদনহীন খারিজি মাদ্রাসা যেমন রমরমিয়ে চলছে, তেমনি হরিশ্চন্দ্রপুর, চাঁচল, রতুয়াতেও বেসরকারি মাদ্রাসার সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। মালদা জেলায় অনুমোদন প্রাপ্ত মাদ্রাসার সংখ্যা যেখানে ৮১, সেখানে অনুমোদনহীন মাদ্রাসার সংখ্যা ৪৬০টির মতো এই সব মাদ্রাসাগুলিতে যেমন হাফিজি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যার মাধ্যমে মৌলবি তৈরি হচ্ছে, তেমন হোস্টেলে ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে এবং আরবি উর্দু শিক্ষার মাধ্যমে উগ্র ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করছে। বিদেশ থেকে এইসব মাদ্রাসাগুলিতে টাকা আসছে। কয়েক বছর আগে আরব থেকে একটি চেক আসে কালিয়াচকের একটি অনুমোদনহীন মাদ্রাসাতে। কিন্তু সরকারি আর একটি মাদ্রাসা পাশাপাশি একই নামে চলত এবং সেই চেক সরকারি মাদ্রাসাতে চলে আসায় তা নিয়ে গণ্ডগোল বেধেছিল। শেষে নিজেদের মধ্যে বসে মীমাংসা হয়। এছাড়া মুসলমান গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের সাহায্যে রেশন কার্ড ও ভোটার লিস্টে নাম তোলার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশি ছাত্ররা সীমান্তবর্তী এবং হরিশ্চন্দ্রপুর, চাঁচল ও রতুয়ার বিভিন্ন অনুমোদনহীন মাদ্রাসাতে ভর্তি হয়ে পরবর্তীকালে দেশের নাগরিক হয়ে যাচ্ছে।

কালিয়াচক, সুজাপুর এলাকাতে ১০-১২ বিঘা জমি নিয়ে অনুমোদনহীন মাদ্রাসা তৈরি হলেও এই মাদ্রাসাগুলিতে কারা আসছে, কারা পড়াচ্ছে, মাদ্রাসা তৈরির জন্য কারা জমি দিচ্ছে, কোথা থেকে এত বড় বড় বিল্ডিং তৈরির টাকা আসছে সেই সব নিয়ে বিস্তারিত কোনো তথ্যই প্রশাসনের কাছে নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে ইংলিশ বাজারের যদুপুর থেকে নিষিদ্ধ সংগঠন 'সিমির' রাজ্য নেতা সামসুদ্দোহাকে পুলিশ তার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে। চার বছর জেল খাটার পর সিপিএম ও কংগ্রেসের বদান্যতায় সে ছাড়া পেয়ে যায় এবং বর্তমানে সে প্রধান শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত। জানা গেছে এই সংগঠনের কাজ গোপনে মালদা জেলার অনুমোদনহীন মাদ্রাসাগুলিতে চলেছে। গোয়েন্দা দপ্তর সক্রিয় হলে মালদা জেলার সীমান্তবর্তী এই সব অঞ্চল থেকে জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত বহু মাথাকে ধরতে সক্ষম হবে। কিন্তু সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ এই সব বেসরকারি মাদ্রাসার ওপরে নেই।

একইভাবে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সীমান্ত এলাকাতে গত দশ বছরে নতুন নতুন অনেক বেসরকারি মাদ্রাসা ও মসজিদ গজিয়ে উঠেছে। এই জেলার হিলি, কুমারগঞ্জ, গঙ্গারামপুর ব্লকের বেশকিছু মাদ্রাসা সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া গেছে তা উদ্বেগজনক। বাংলাদেশ থেকে বেশ কিছু কাঁটাতারবিহীন অঞ্চল দিয়ে মানুষ এই মাদ্রাসাতে যাতায়াত করে। বাংলাদেশের বহু জঙ্গি এই মাদ্রাসায় আশ্রয় নিতে পারে বলে অনেকেই মনে করছেন। কারণ অপরিচিত মুখ তাদের চিন্তা আরও বাড়িতে তুলেছে। উল্লেখ্য, গত ৭ নভেম্বর মালদা জেলার কালিয়াচকের ১৬ মাইল থেকে জিয়াউল শেখ নামে এক স্কুল শিক্ষক, (আরবি) এন আই এ খাগড়াগড় কাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে গ্রেপ্তার করেছে। ■

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর, মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

কলকাতায় আর এস এসের সেবা শিবিরে তৃণমূলের হামলা

সংবাদদাতা ॥ কলকাতার খিদিরপুর এলাকায় গঙ্গার দইঘাটে ছটপূজা উপলক্ষে পুণ্যার্থীদের সেবার জন্য আয়োজিত আর এস এসের সেবা শিবিরে হামলা চালায় স্থানীয় তৃণমূল সমর্থকরা। প্রতি বছরই দইঘাটে আর এস এসের স্বয়ংসেবকরা ছটপূজা দিতে আসা পুণ্যার্থীদের চা, সরবত ও অন্যান্য সহযোগিতা করে থাকেন। গত ২৯ অক্টোবর সকাল সাড়ে ৮টায় তৃণমূল সমর্থকরা হামলা চালিয়ে সেবারত স্বয়ংসেবকদের শিবির তুলে নিতে বলে। তৃণমূল সমর্থকদের মারে কয়েকজন স্বয়ংসেবক জখম হন। স্বয়ংসেবকরা যথারীতি তৃণমূলের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। আর এস এস সূত্রে খবর, প্রতি বছরের মতো পৌরসভার থেকে অনুমতি নিয়েই সেবাশিবির লাগানো হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তৃণমূল সমর্থকরা হামলা করেছে। স্থানীয় আর এস এস কার্যকর্তার কথায় --- তাদের জনপ্রিয়তায় ভয় পেয়েই তৃণমূল গুণ্ডাবাজি শুরু করেছে। আর এস এসের দক্ষিণবঙ্গের প্রচার প্রমুখ ড. জিষ্ণু বসু সেবারত স্বয়ংসেবকদের ওপর তৃণমূলের হামলার নিন্দা করে বলেন— “আগে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের আমলে আর এস এসের ওপর হামলা হোত, এখন তৃণমূলের শাসনকালে এই অত্যাচার আরো বেড়েছে। এত বেড়েছে যে, ছটপূজা দিতে আসা পুণ্যার্থীদের সেবায় ব্যস্ত স্বয়ংসেবকদের ওপরও হামলা চালাচ্ছে তৃণমূল। এর থেকে পরিষ্কার যে, আর এস এসের প্রভাব বৃদ্ধিতে তৃণমূল পাগল হয়ে গিয়েছে। এখন তো তারা দেশবিরোধী শক্তিকেও মদত দিতে শুরু করেছে।”

সংবাদ প্রতিবেদন

উত্তরবঙ্গের মাদ্রাসাগুলিকে নিয়েও নানা সন্দেহ দানা বাঁধছে

সংবাদদাতা ॥ বর্ধমান কাণ্ডের পর উত্তরবঙ্গের সীমান্তবর্তী এলাকায় কান পাতলেই মসজিদ ও মাদ্রাসাগুলিকে নিয়ে নানা রকম কথা শোনা যাচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন খাগড়াগড় বিস্ফোরণের পর পর কোচবিহারের শীতলকুচি, বড়মরিচা, গোলেনাহাটি এলাকার বেশ কিছু মসজিদে অচেনা মুখের আনাগোনা দেখা যাচ্ছে। কেউ এমনও বলছেন টিভিতে দেখানো সন্দেহভাজনদের স্কেচের সঙ্গে নাকি এই সমস্ত অচেনা মুখের মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। এই সমস্ত এলাকায় বাংলাদেশিদের দ্বারা পরিচালিত বেশ কিছু অনুমোদনহীন মাদ্রাসা বর্ধমান কাণ্ডের পর আর খোলেনি বা অনিয়মিত ভাবে খুলছে বা বন্ধ হচ্ছে এমন খবরও আসছে। এই সমস্ত মাদ্রাসার সঙ্গে যুক্ত স্থানীয় বাসিন্দাদের কেউ কেউ নাকি রিক্সাভ্যান চালক থেকে অজ্ঞাত উপায়ে কোটিপতি হয়ে এখন স্থানীয় মুসলমানদের কাছে আল্লার ফেরেস্তার মতো সম্মান পাচ্ছে। ঝামেলায় জড়ানোর ভয়ে এলাকাবাসী এই সমস্ত খবর প্রশাসনকে জানাতে সাহস পাচ্ছেন না।

মিডিয়া রিপোর্ট অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে নাকি সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত এমন ১২৫টি মাদ্রাসাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিভিন্ন এনজিওর নামে বিদেশি অর্থে পরিচালিত কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালদা, মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত এই সমস্ত মাদ্রাসা যে আলকায়দা-সহ বিভিন্ন ইসলামিক জঙ্গিগোষ্ঠীর আঁতুড় ঘর সেই সংক্রান্ত তথ্যও নাকি রাজ্য, কেন্দ্র ও সামরিকবাহিনীর গোয়েন্দারা সংগ্রহ করেছেন। স্থানীয় একটি সংবাদপত্রের প্রকাশিত রিপোর্ট বলছে, শুধুমাত্র আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারীহাট, কালচিনি, ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার-১ এবং কুমারগ্রাম ব্লকে ১০২টি অনুমোদনহীন মাদ্রাসা রয়েছে। জলপাইগুড়িতে এই সংখ্যাটি ২৩। এই সমস্ত এলাকায় গিয়ে খোঁজ নিলেই জানা যাবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাইরের অজ্ঞাত পরিচয় লোকেরাই মূলত এই সমস্ত মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে কাজ করে থাকে। বিভিন্ন রকমভাবে রটছে যে এই সমস্ত মাদ্রাসাতে নাকি প্রশাসন তল্লাশি চালাবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কবে রহস্যের ঘেরাটোপে থাকা মাদ্রাসাগুলি সম্পর্কে প্রকৃত রহস্য উদঘাটিত হবে? প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হওয়ার আগেই সন্দেহভাজনরা নিরাপদ দূরত্বে সরে পড়বে নাতো?

সাপে-নেউলে জোট

বুনো ওলের পাশে বাঘা তেঁতুল

শ্রী লালুপ্রসাদ যাদব
রাষ্ট্রীয় জনতা দল সুপ্রিমো
সমনপুর, পাটনা
বিহার

লালুজী নমস্তে। হাসি মজাক কি বাত নেহি। আপসে সিরিয়াস ডিসকাশন হ্যায়। আপনি সত্যিই এক সাধু উদ্যোগ নিয়েছেন। মোদীকে রুখতে বৃহত্তর জোট। ভারতীয় রাজনীতির জোট ইতিহাসে এক নয়া সংযোজন। কেয়াবাৎ। মুলায়ম সিং, এইচ ডি দেবেগৌড়া, নীতিশ কুমারদের নিয়ে এক প্রস্থ বৈঠকও সেরে ফেলেছেন। সত্যিই এছাড়া উপায় নেই। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে রেকর্ড গড়া সংখ্যা নিয়ে সরকার গঠনের পর রাজ্যে রাজ্যেও থাবা বসাতে চাইছে বিজেপি। কিন্তু সেটা হতে দেওয়া যায় না। 'শত্রুর শত্রু বন্ধু' থিওরিতে জোট বাঁধতেই হবে। আরে বাবা রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বাঁচিয়ে রাখতে হবে তো! এ দেশে অনেক নামে অনেক জোট হয়েছে। এবার নয় সমাজবাদী জোট নামে নতুন সন্তান ভূমিষ্ঠ হোক।

কিন্তু লালুজী একটা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। আপনি যেসব দলের সঙ্গে দোস্তি করছেন তারা তো এককে রাজ্যের। তাহলে বিজেপিকে রুখবেন কী করে? এই দেখুন, জোট গড়ে মুলায়ম সিংজী যদি আপনাকে উত্তরপ্রদেশে গোটা দশেক সিট ছেড়েও দেন তবে আপনার কীইবা হবে? মুলায়মজীর না হয় দশটা আসনে লড়ার খরচা বেঁচে যাবে কিন্তু আপনার কী হবে?

তবে হ্যাঁ, সামনের লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত জোট টিকিয়ে রাখতে পারলে একটা লাভের লাভ হলেও হতে পারে। তাতেও রাজ্যে রাজ্যে একসঙ্গে লড়াই সম্ভব নয়। কিন্তু একসঙ্গে সরকার গড়ার স্বপ্ন দেখা যেতে পারে। আর কিছু না হোক হেরে যাওয়ার পর একের ওপরে আর এক দোষ চাপিয়ে বাজার গরম করা যাবে। হারের দায় মুক্ত হওয়া যাবে।

এখনও পর্যন্ত আপনার যে জোট গড়েছেন তাতে লোকসভার শক্তি ১৫ আর রাজ্যসভায় ২৫। এ নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিজেপি সরকারের কিছুই করা সম্ভব নয়। কোনো উদ্যোগেই বাধা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে লোকসভা, রাজ্যসভায় দল বেঁধে হইহট্টগোল করে সময় নষ্ট করা যেতেই পারে।

সুতরাং কংগ্রেসকে সঙ্গে নিন। খান ৪২ সদস্য আছে লোকসভায়। তবে তখন বাঁকা বাঁকা প্রশ্ন উঠতে পারে। ১৯৮৮ সালে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একজোট হতেই জনতা পার্টি আর ভারতীয় লোকদল মিলিয়ে জনতা দল গড়েছিলেন বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ। কিন্তু নব্বইয়ের দশকে লালুজী আপনি, নীতিশজী, মুলায়মজীদের উদ্যোগে আলাদা আলাদা দল হয়ে গেল। এখন আবার রি-ইউনিয়নের উদ্যোগ দেখে সাধু সাধু বলতেই হবে।

আগামী বছর বিহারে বিধানসভা ভোট। তারপর ২০১৭ সালে উত্তরপ্রদেশে ভোট। আর তাতে যে বিজেপি দারুণ ফল করবে তা এখন থেকেই ভবিষ্যদ্বাণী করছেন রাজনীতির কারবারিরা। তবে তার আগেই আপনি যে উদ্যোগ নিয়েছেন তাতে কী হবে জানি না। তবে আবার একটা থার্ড ফ্রন্ট, থার্ড ফ্রন্ট গন্ধ পাচ্ছি। কিন্তু থার্ড ফ্রন্ট করবেন আর সিপিএমকে সঙ্গে নেবেন না সেটা আবার হয় নাকি। ক্ষমতা না থাকুক 'থার্ড ফ্রন্ট' পেটেন্টটা তো ওদের আছে। সুতরাং প্রকাশ কারাতদের প্লিজ মিটিংয়ে ডাকুন। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে একদম হাত বাড়াবেন না। এবার লোকসভা ভোটের আগে উনি কত সাধাসাধি করেছেন, আসুন সবাই মিলে জোট করি। তখন তো কেউ সাড়া দেননি। এখন ডাকলে উনিও সাড়া দেবেন না। তাছাড়া এখন দল সামলাতে মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল অবস্থা। এখন ওসব জোট ফোট করার সময় নেই তৃণমূল নেত্রীর। পুরসভা বাঁচবে কিনা তাই প্রশ্ন। তার ওপর লালু মুলায়মের ভবিষ্যৎ ভাবতে ওঁর বয়েই গেছে। ওদিকে জয়ললিতা দেবী তো কোর্ট কাছারি, সম্পত্তি নিয়ে রীতিমতো জলে পড়েছেন। রইলেন মায়াবতী। মুলায়ম সিং মায়াবতীকে এক মঞ্চে তুলতে পারলে তো কেল্লাফতে। প্রচার যা পাবেন তাতেই যুদ্ধ জয় হয়ে যাবে। হেডিং হবে— এক মঞ্চে সাপ আর নেউল। বাঘা তেঁতুলের পাশে হাসি মুখে বুনো ওল।

তবে সিপিএম এখন গোঁসা ঘরে। সম্প্রতি পার্টি কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত হয়েছে আপনাদের সঙ্গে হাত মেলানো হবে না, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তৃতীয় ফ্রন্টের পেটেন্টও নাকি তারা ছেড়ে দিতে পারে। কারণ, নীতীশ, মুলায়মদের কংগ্রেস বিজেপি-র সঙ্গে হাত মেলানোর অতীত ইতিহাস আছে।

এসব কে পাত্তা দেবেন না লালুজী। যার নিজের নৌকোই ডুবছে সে বলছে কারও হাত ধরবে না। ছেড়ে দিন। আপনি জোট মিটিং করে যান। পশুখাদ্য থেকে মজার জোকস, যে-কোনো ব্যাপারে আপনার তুল্য প্রচারে আসা নেতা নেই দেশে। আমি তো বলি, যব তক সমোসা মে আলু রহেগা, মিডিয়া প্রচারে লালু রহেগা।

— **সুন্দর মৌলিক**

পশ্চিমবঙ্গে এখন হবুচন্দ্র গবুচন্দ্রের রাজত্ব চলছে

লাভ জেহাদের কথা নিশ্চয় শুনেছেন। তালিবানি জঙ্গিরা হিন্দু ঘরের মেয়েদের প্রেমের নামে ইসলাম কবুল করতে বাধ্য করতো। এই লাভ জেহাদের জন্মস্থান হচ্ছে কেরল। সম্প্রতি এই কেরল রাজ্য থেকেই শুরু হয়েছে 'লাভ কিস্'। প্রেম চুম্বন। বিশেষ একটি জাতের অতি আঁতেল কু-বুদ্ধিজীবী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মগজ ধোলাই করে বোঝাচ্ছেন, প্রকাশ্যে বান্ধবীকে চুম্বন ও আলিঙ্গন করাটা ব্যক্তি-স্বাধীনতা। মানবাধিকার। আমেরিকায় ছাত্রছাত্রীরা কলেজ ক্যাম্পাসে শিক্ষকদের উপস্থিতিতেই এসব করে। তাই ভারতেও প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের শুধুই প্রকাশ্যে চুম্বনই নয়, অবাধ যৌনতার অধিকার দিতে হবে। বিষয়টিকে পাঠ্য সিলেবাসে সেক্স্ এডুকেশন শিক্ষা বলে চালাতে হবে। আপত্তি করা চলবে না। আপত্তি করলে আপনি বর্বর, অশিক্ষিত, রক্ষণশীল, গবেট বলে চিহ্নিত হবেন। মানবাধিকার স্বেচ্ছাসেবকরা আপনাকে রামভক্ত হনুমান বলে সকাল সন্ধে খিস্তি করবে। কারণ, খিস্তি করাটাও মানবাধিকারের মধ্যে পড়ে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং মানবাধিকার বিষয়টির ব্যাপ্তি এতটাই যে তার সীমা নেই। রুচি ও অ-রুচির কথাটা তোলা যাবে না। যার যা ইচ্ছা, যেমন ইচ্ছা করাটাই এখন ব্যক্তি-স্বাধীনতা। আমরা এতকাল যে সব কাণ্ডকারখানা মোচ্ছবকে বেলেল্লাপনা বলে জেনে এসেছি এখন সেটাই ব্যক্তি-স্বাধীনতা। সামাজিক, অসামাজিক কাজ বলে কিছু হয় না। হবে কী করে। সমাজ বলেই কিছু আছে তা মোটেই স্বীকার করেন না নব্য আধুনিক-আধুনিকারা।

কলকাতায় লাভ কিস্ বা কিস অব লাভের সূত্রপাত অক্টোবরের শেষদিকে। উত্তর কলকাতার প্রাচীন ঐতিহ্যশালী স্টার থিয়েটারে সিনেমা দেখতে এসেছিল ১৭ বছরের এক তরুণী। তার পরনে ছিল মিনি স্কার্ট। এতটাই মিনি যে তার শরীরের নিম্নাঙ্গের অন্তর্বাস দেখা যচ্ছিল। স্টার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ এমন অশালীন পোশাকে হলে ঢুকতে বাধা দেয়। এই নিয়ে বচসা থানা পুলিশে গড়ায়। সংবাদমাধ্যমে ঘটনাটি প্রকাশিত হলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের একদল অতি বামপন্থী এবং চূড়ান্ত প্রগতিশীল ছাত্রছাত্রীরা মিছিল করে প্রকাশ্যে চুম্বন প্রতিযোগিতা শুরু করে দেয়। মমতা সরকারের পুলিশ অসহায়। দিদি কিছু বলছেন না। দিদি নির্দেশ না দিলে পুলিশের হাত পা বাঁধা। কে জানে হয়তো চুম্বনকারী এবং

গূঢ়পুরুষের

কলম

চুম্বিতারা ভোটের সময় শাসকদলের হয়ে খাটাখাটি করতে পারে। তাই ইমমরাল বা ইনডিসেন্ট অ্যাক্টিভিটি আইনে গ্রেপ্তার করে থানায় লাঠিপেটা করলে পুলিশের চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়বে। নবান্ন থেকে দিদি বলতেই পারেন, 'ব্যাচারারা ভাল করে খেতে পায় না। তাই একটু চুমু খাচ্ছে। তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। বরং যারা ওদের বাধা দিচ্ছে তাদের আচ্ছা করে লাঠিপেটা করো। রামভক্তের দল এই রাজ্যে দাঙ্গা লাগাতে চাইছে।' এবার ঠ্যালাটা বুঝুন। দিদি পশ্চিমবঙ্গকে তালিবান রাজ্য করতে চাইছেন। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ বারাসতে প্রতিবাদী মিছিল বের করলে তালিবানি মুসলমান তৃণমূল কর্মীরা পুলিশের সাহায্যে বেধড়ক পেটায়। পশ্চিমবঙ্গে অবৈধ বা খারিজি মাদ্রাসা বন্ধ করতে বললে পুলিশ পিটিবে। কিন্তু প্রকাশ্যে সহপাঠিনীকে চুম্বন আলিঙ্গন করলে পুলিশ নির্বাক দর্শক। পশ্চিমবঙ্গে এখন হবুচন্দ্র গবুচন্দ্রের রাজত্ব চলছে।

গত ২৬ অক্টোবর কেরলের কোঝিকোড় শহরের একটি সুপরিচিত কফিশপে কলেজ পড়ুয়া একদল ছাত্রছাত্রী প্রকাশ্যে দীর্ঘতম চুম্বন প্রতিযোগিতা শুরু করে দেয়। তারা আগেভাগেই সংবাদমাধ্যমকে জানিয়ে রেখেছিল। স্থানীয় টেলিভিশন নেটওয়ার্কে লাইভ কভারেজও চলতে থাকে। এই অসভ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে কয়েক হাজার মানুষ জমায়েত হয় এবং তথাকথিত ছাত্রছাত্রীদের গণপিটুনি দেয়। পরের দিন দিল্লীর বড় বড় ইংরেজি ও হিন্দি কাগজে লেখা হয় বিজেপি, বজরঙ্গ দল এবং আর এস এস স্বেচ্ছাসেবকরাই কচি কচি ছেলেমেয়েদের পিটিয়েছে। সঙ্ঘের স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে হরিয়ানার খাপ পঞ্চায়েতের তুলনাও টানা হয়েছে। সংবাদমাধ্যমের ইন্ধনে হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসেও প্রকাশ্যে ছাত্রীদের চুম্বন করা হয়। এই নোংরামির বিরুদ্ধে একমাত্র অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ দেশজুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলন চালাচ্ছে। দ্বিতীয় আর কোনো ছাত্র সংগঠনকে প্রতিবাদী ভূমিকায় দেখছি না। দিল্লীতে বিদ্যার্থী পরিষদ কর্মী সমর্থকরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রকাশ্যে চুম্বনের বিরোধিতাই করছেন তা নয়। বিদ্যার্থী পরিষদ জানিয়ে দিয়েছে যে ছাত্রছাত্রীদের বিবাহহীন লিভ টুগেদার বা লিভ ইন রিলেশনশিপ ভারতীয় সংস্কৃতির বিরোধী। এতে ক্ষেপে গিয়ে ময়দানে নেমেছেন দেশের তাবড় তাবড় বামপন্থী আঁতেলরা। দিল্লী থেকে সম্প্রচারিত জাতীয় টেলিভিশন চ্যানেলে এইসব আঁতেলদের তড়পানি দেখে চমক লাগে। ছাত্রছাত্রীদের চুম্বন থেকে লিভ ইন রিলেশন সবই নাকি মানবাধিকার। ব্যক্তি-স্বাধীনতা। যেমন, বেশ্যাকে যৌনকর্মীর মর্যাদা দিতে হবে। প্রয়োজনে পুত্রবধূও করতে হবে। আপত্তি করলে বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়িকে বধূ নির্যাতনের মামলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। বর্ধমানের খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কাণ্ডের পর দেখা যাচ্ছে যে পুরুষ জঙ্গিদের থেকে মহিলা জঙ্গিরা অনেক বেশি হিংস্র। উত্তরপ্রদেশের ফৈজাবাদে মহিলা ডাকাতের দল পুলিশকে নাকানি চোবানি খাওয়াচ্ছে।

একটা কথা সত্য যে প্রকাশ্যে চুম্বনের অধিকার চাওয়ার সাম্প্রতিক আন্দোলনে ছাত্রীরাই অগ্রগামিনী। এরা পরে কারোও স্ত্রী এবং পুত্রবধূ হবে। ভাবলেই মনে হয় নরকবাস করছি। ■

‘আচ্ছে দিন’ আসছে কি ?

দিব্যজ্যোতি চৌধুরী

নির্বাচনী প্রচারে আজকের প্রধানমন্ত্রীর সদম্ভে ঘোষণা ভালো দিন আসছে বলে, আর ক্ষমতায় এসে ‘ভালো দিন এসে গেছে’ মন্তব্য কি শুধুই স্বপ্ন দেখানোর খেলা, না কি এর কোনো বাস্তবতা আছে, এ নিয়ে আজ অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগেছে। প্রশ্ন ওঠাটাও স্বাভাবিক। নির্বাচনের সময় মোদীজীকে নিয়ে যে গণউন্মাদনা দেখা গেছে তাতে তাঁর ভাবমূর্তি শুধু একটা প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। রাতারাতি সব সমস্যার সমাধান করে দেবেন এমন একজন মন্ত্রশক্তিধারী অবতারের মতো তাঁকে মনে হয়েছে অনেকের কাছেই। তাই অল্প সময়ে বিরাট কিছু একটা পরিবর্তন না দেখে অনেকের মনে একটা হতাশার ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

ক্ষমতায় এসে প্রধানমন্ত্রী কিন্তু বলেছিলেন যে আমাদের আরোও বেশ কিছুদিন কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে চলতে হবে। একজন দুঁদে রাজনীতিক হিসেবে শ্রীমোদী বিলক্ষণ জানতেন যে ইউপিএ সরকারের ক্রমাগত অপশাসন আর আঞ্চলিক দলগুলির অন্তঃসারশূন্যতায় হতাশ জনগণ এবার বিজেপিকেই ক্ষমতায় আনবেন। তাহলে আগ বাড়িয়ে তিনিই-বা কোন যুক্তিতে সুদিনের স্বপ্ন দেখালেন ? আসলে সুদিন ফেরানোর ব্যাপারে তিনি যে একশো ভাগ প্রত্যয়ী ছিলেন এমন ভাবলে কি খুব একটা ভুল হবে ? নিজেকে একজন ব্যতিক্রমী প্রশাসক প্রমাণ করার তাগিদ সবসময়ই তাঁর ভেতরে কাজ করেছে। তাই উন্নয়নের ধ্যানধারণায় তিনি আমূল বদল আনতে চেয়েছেন। নিছক কিছু প্রকল্প ঘোষণা না করে তিনি সর্বস্তরে এমন পরিকাঠামো প্রবর্তন করতে চেয়েছেন যেখানে উন্নয়ন হবে একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।

এবার দেখা যাক স্বল্প সময়ে সরকারি পদক্ষেপ প্রতিশ্রুতি রক্ষার সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। ক্ষমতায় এসেই নতুন সরকার প্রথম বাজেট পেশ করেছে এবং যেহেতু এর মেয়াদ পুরো এক বছরের নয়, তাই এ বছরের বরাদ্দগুলিকে বরাদ্দ হিসেবে না দেখে, সরকারি অভিপ্রায়ের ইঙ্গিত হিসেবে দেখাই যুক্তিযুক্ত। আর্থিক বৃদ্ধি, মূল্যবৃদ্ধি কমানো, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের চলতি খাতে ঘাটতি হ্রাস এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রতি অবিচল দায়বদ্ধতা— এই চার লক্ষ্য সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। অনুৎপাদক ভরতুকির জামানা থেকে এই সরকার বেরিয়ে আসতে চাইছে। এবার থেকে ভরতুকি ভারাক্রান্ত সরকারি কর্মসংস্থান তৈরির পেছনে অর্থব্যয় না করে বরং যথার্থ গ্রামীণ পরিকাঠামো তৈরির মাধ্যমে গ্রামে কর্মসংস্থান করার কথা বলা হয়েছে। নতুন রাস্তাঘাট বানানো, বন্দর নির্মাণ, পুরোনো জলপথ সংস্কার, নতুন আই আই টি, আই আই এম, এইমস্ তৈরির কথা বাজেটে বলা হয়েছে। এই সব ঘোষণার মধ্যে দিয়ে সরকার মনে হয় এই বার্তাটাই দিতে চেয়েছে যে, মানুষকে অনন্তকাল ভরতুকি দিয়ে বাঁচিয়ে রাখাটা একটা ব্যর্থ প্রচেষ্টা মাত্র। তা না করে বরং উপযুক্ত পরিকাঠামো প্রবর্তনের মাধ্যমে তার উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে তাকে স্বনির্ভর ও প্রতিযোগিতার উপযুক্ত করতে পারলে ব্যক্তি ও দেশ সকলেরই লাভ। সেই লাভ যে উচ্চতর আর্থিক বৃদ্ধির আকারে অচিরেই দেখা দেবে তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। বিদেশি বিনিয়োগকে অচ্ছুৎ মনে করছে না এই সরকার। উন্নততর প্রযুক্তি, জিনিসের উন্নত মান, এসবই আসে বিদেশি বিনিয়োগের হাত ধরে। দেশের বাজারে বিদেশিরা এলে প্রতিযোগিতা বাড়ে। দেশি কোম্পানিগুলিকে আরও তৎপর হতে হয়। ফলে লাভবান হন ক্রেতারা। কিন্তু বিদেশি বিনিয়োগ কখনোই স্বদেশি উদ্যোগের বিকল্প হতে পারে না। দেশে শিল্পের জোয়ার আনতে হবে দেশি শিল্পপতিদের উদ্যোগের মধ্যে দিয়েই। একথা মাথায় রেখেই তিনি নিয়ে এলেন ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’-র ধারণা, যাকে দেশের অর্থনীতির হাল ফেরানোর মোক্ষম দাওয়াই বলে মানছেন অনেকে। তিনি আহ্বান জানিয়েছেন— “আসুন, যাবতীয় পণ্য ভারতে তৈরি করুন। তারপর তা বিক্রি করুন এদেশের বিশাল বাজারে। রপ্তানি করুন বাকি বিশ্বেও।” তাঁর আশ্বাস— সমস্যা হলে কেন্দ্র হস্তক্ষেপ করবে, কথা বলবে রাজ্য সরকারের সঙ্গেও। এ যে শুধু কথার কথা নয় তার জলজ্যান্ত প্রমাণ হলো এ রাজ্যে মিৎসুবিশি কেমিক্যালস্-কে বাঁচাতে কেন্দ্র বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের রিপোর্ট অনুযায়ী লগ্নির পরিবেশ হিসেবে ভারতের স্থান বর্তমানে ১৩৪ তম। সেখান থেকে প্রথম পঞ্চাশে দেশকে টেনে তুলতে চান তিনি। বিদেশি লগ্নির পেছনে ছুটতে গিয়ে তাঁর সরকার যে সাধারণ মানুষকে ভুলবেন না তা বোঝাতে তাঁর মন্তব্য এফ ডি আই মানে ‘ফার্স্ট’ ডেভেলপ ইন্ডিয়া’ও। মোদী জামানায় আস্থা যে ফিরেছে তা অকপট স্বীকার করেছেন আম্বানি, মিস্ত্রি, প্রেমজি, বিড়লার মতো শিল্পপতিরা। মুকেশ আম্বানির দাবি তাঁর গোষ্ঠী আগামী ১২ থেকে ১৫ মাসে লগ্নি করবে ১ লক্ষ ৮০ হাজার কোটি টাকা। তাতে তৈরি হবে বিপুল কাজের সুযোগ। শিল্পমহল মনে করছে যে এই কদিনেই প্রশাসনে গতি এসেছে। ঘুচেছে নীতিপঙ্গুত্বের সমস্যা। শিল্পে লাইসেন্সের জন্য আবেদন প্রক্রিয়া সহজ হয়েছে। ‘ইন্সপেক্টররাজ’ খতম করে নানারকম অনুমোদন ও ছাড়পত্রের প্রক্রিয়া সহজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে রাজ্য-সরকারগুলিকেও।

গত চার-পাঁচ বছরে যে মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে, তার সিংহভাগ হয়েছে কৃষিজাত

খাদ্যদ্রব্যে। এই বৃদ্ধি বশে আনার জন্য বিশেষ ধরনের গ্রামীণ বাজার তৈরি করার কথা বাজেটে রয়েছে। এই বাজারগুলো হলে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কমে খাদ্যদ্রব্যের দামও কমবে। রাজকোষের ঘাটতি কমিয়ে লাগাম পরানো হয়েছে মুদ্রাস্ফীতিতে।

অন্যদিকে দু'টি অভুতপূর্ব পদক্ষেপ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোটিকে পুনরুজ্জীবনের জন্য সরকার সদিচ্ছা দেখিয়েছে। এক, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের জায়গায় কেন্দ্রীয় অনুদান হিসেবে এখন থেকে রাজ্যগুলিকে যে টাকা দেওয়া হবে, তা খরচ করার ক্ষেত্রে রাজ্যগুলিকে অনেক বেশি স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। দুই, কেন্দ্র থেকে যে অর্থ রাজ্যগুলি পায় তার পরিমাণ বছরে তিন গুণ বাড়ানো হয়েছে।

নতুন সরকার একদিকে যেমন শিল্পবান্ধব পরিবেশ তৈরি করেছেন, আবার সামাজিক দিকেও সমান গুরুত্ব দিচ্ছেন। যুগান্তকারী জন-ধন যোজনার মাধ্যমে সব পরিবারের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে একদিকে যেমন আমজনতাকে দিয়েছেন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, তেমনি অন্যদিকে গরিবরা এখন থেকে এই অ্যাকাউন্টেই সরাসরি উন্নয়ন প্রকল্পের টাকা পাবেন। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচিকে সফল করার লক্ষ্যে শ্রমিকদের দক্ষ করতে 'শ্রমেব জয়তে'-র মাধ্যমে সরকার শ্রমিক কল্যাণে একগুচ্ছ সংস্কার এনেছেন। জটিল শ্রমবিধির জামানা বদলে দিয়ে বিনিয়োগমুখী পরিবেশ তৈরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে অর্জন করেছেন শিল্পপতিদের আস্থা। সরকার স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও আনতে চলেছেন বিপুল সংস্কার। শুধু রোগ হলে তার চিকিৎসা নয় রোগকে ঠেকাবার জন্য 'প্রিভেন্টিভ ট্রিটমেন্টে'র উপরও জোর দেওয়া হচ্ছে। বারাক ওবামার 'সকলের জন্য স্বাস্থ্য'-র নীতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতেও সব আর্থিক স্তরের মানুষের জন্য স্বাস্থ্য বিমা চালু হতে চলেছে 'ইউনিভার্সাল হেলথ্ অ্যাসিওরেন্স প্রোগ্রাম'-এর মাধ্যমে। ৫০টি অতি প্রয়োজনীয় ওষুধ এবং একই সংখ্যক জরুরি পরীক্ষা-নিরীক্ষার খরচ যাতে কোনো সংস্থাই কোনোভাবে আটকাতে না পারে, ইতিমধ্যেই তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অল্প সময়েই এই সরকার বিদেশনীতিতে অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। সাম্প্রতিককালে ভারতের অবসাদগ্রস্ত বিদেশনীতি দেখে মনে হয়েছে, তার বড় কোনো লক্ষ্য নেই। ভারত তার পারমাণবিক শক্তি, বিরাট সেনাবাহিনী, উন্নত নৌ-বাহিনী এবং আধুনিক বিমানবাহিনী নিয়ে আন্তর্জাতিক কূটনীতির মঞ্চে প্রথম সারিতে স্থান নেবার ক্ষমতা রাখে, কিন্তু সেই স্থান সে এখনও দাবি করেনি। মোদীজীর দ্বিধাহীন বিদেশনীতি শুধু চীন নয়, বিশ্বের তাবড় শক্তিশালী রাষ্ট্রচালকদেরও চমৎকৃত করেছে। নেপালে গত ১৭ বছরে কোনো ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী সফর করেননি। শ্রীমোদী বলেছেন যে ভারত প্রতিবেশীদের প্রতি মনযোগী হয়ে, তাদের নানারকম সুযোগ সুবিধা দিলে তাদের মনোভাবও ভারতের প্রতি অনুকূল হবে। ভুটান ও নেপালে তাঁর অত্যন্ত সফল সফর এবং তাঁর বিদেশমন্ত্রীর বাংলাদেশ যাত্রা দেখিয়ে দিয়েছে, তাঁর অগ্রাধিকার কোথায়। প্রধানমন্ত্রী কারগিলে গিয়ে ছায়াযুদ্ধ বন্ধ করার জন্য পাকিস্তানকে কড়া বার্তা দিয়েছেন। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, ভারত তাঁদের আর বিশেষ ছাড় দেবে না। পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতের কাশ্মীরি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে কথা বলার প্রতিবাদে বিদেশ সচিব পর্যায়ের বৈঠক আকস্মিকভাবে বাতিল করে দিল্লী এই পরিবর্তিত কঠোর মানসিকতাই বুঝিয়ে দিয়েছে। চীনের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন অঞ্চলে আগ্রাসী মনোভাব এশিয়ার নানা দেশে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। এই প্রেক্ষিতেই জাপান ভারতের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সহযোগিতায় আসতে চায়। শুধু তাই নয়, জাপান সফরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শিল্প ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিপুল বিনিয়োগ ও সাহায্যের আশ্বাস নিয়ে এসেছেন। চীনের শাসকরা যে মোদীজীর সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে ব্যগ্র তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। অন্য দিকে জার্মানি নিজেকে ক্রমশই একটি ইউরোপীয় শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে এবং ভারতের সঙ্গে তার দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা উজ্জ্বল। কারণ সে ভারতকে এশিয়ার সুস্থিতির বিশেষ অনুকূল একটি শক্তি মনে করে। সম্প্রতি সফল মহাকাশযান প্রেরণের মাধ্যমে একদিকে ভারত বিশ্বের দরবারে তার সবল উপস্থিতি জানান দিয়েছে, তেমনি অন্যদিকে ভারতের মহাকাশ গবেষণা ভিন্ন মাত্রায় পৌঁছেছে।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে উল্লেখ্য হলো জমি অধিগ্রহণ বিল বদলের উদ্যোগ, বিচারপতিদের নিয়োগ ব্যবস্থার সংস্কার, সরকারের অলিন্দে থাকা 'সিলেক্ট গ্রুপ' বা 'পাওয়ার ব্রোকার'-দের ক্ষমতা খর্ব করা ইত্যাদি। বিদেশের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত দেশের কালো টাকা উদ্ধারে বিগত সরকার আশ্বাস দিলেও, নানা কারণ দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত কথা রাখেনি। এই সরকার শুধু আশ্বাসই দেয়নি, প্রধানমন্ত্রী বেতার বার্তায় সে বিষয়ে দেশবাসীর কাছে অঙ্গীকার করেছেন। শুধু তাই নয়, আগামী একশো দিনের লক্ষ্যমাত্রার নকশাও নিঃশব্দে ছকে ফেলেছেন শ্রীমোদী। মহিলাদের জন্য শৌচালয়, কারিগরি শিক্ষা, ই-গভর্নেন্স, নিকাশি ব্যবস্থার মতো কিছু মৌলিক সামাজিক পদক্ষেপ করা শুরু করেছেন প্রধানমন্ত্রী, যেগুলি জনজীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রান্তিক ও দুর্গম এলাকার পাশাপাশি মাওবাদী উপদ্রুত এলাকায় মৌলিক নাগরিক সুবিধাগুলি পৌঁছে দিতে উদ্যোগী হচ্ছে সরকার। পণ্য ও পরিষেবা কর চালু করার জন্য রাজ্যগুলিকে ক্ষতিপূরণ দেবার কাজও শুরু হবে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে। সবুজ বাড়ানোর জন্য প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকা রাজ্যগুলিকে দিতে চায় কেন্দ্র। সাংসদদের একটি করে গ্রাম দত্তক নিয়ে তার উন্নয়ন করে তাকে মডেল গ্রাম বানানোর আহ্বানেও মিলেছে সাড়া।

তবে সংস্কারের সুফল কিন্তু স্বল্প মেয়াদে মেলা সম্ভব নয়। তবুও অর্থনীতির দিকে একটু ভালোভাবে নজর দিলেই বোঝা যাবে যে, সংস্কারের সুফল ধীরে ধীরে ফলতে শুরু করেছে। ■

মাদ্রাসার আড়ালে ব্যাপক জঙ্গি-কার্যকলাপ

জিতেন মিস্ত্রী

গত ২ অক্টোবর ২০১৪, পশ্চিমবাংলার আকাশে-বাতাসে ইসলামি মৌলবাদের এক ভয়াল অশনি সঙ্কেতের সূচনা করলো। হ্যাঁ, বর্ধমানের 'খাগড়াগড়' বিস্ফোরণ। সব দেখে শুনে এখন সবাই ভীত সন্ত্রস্ত। মনে হচ্ছে, এটা কোনোমতেই একটি আকস্মিক বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। দীর্ঘদিন ধরে এর প্রস্তুতি ও ক্রিয়াকলাপ গোপনে চলে আসছিল। রাজ্য জুড়ে ক্রমবর্ধমান করাল পৈশাচিক এই জঙ্গিগোষ্ঠীর 'আঁতুড়ঘর' কিন্তু প্রশাসকের প্রচ্ছায়ায় গজিয়ে ওঠা। মাদ্রাসাগুলিতেই চলছে বিচ্ছিন্নবাদী, ইসলামিক প্রশিক্ষণ। অবশ্য এর সঙ্গে 'মক্তব'ও জড়িয়ে আছে। আরবি-উর্দু কালচারে জারিত মৌলবি মৌলবাদীরা এখানে টেনে আনছে হিংস্র বিদেশি জঙ্গিদের। দু'য়ের মেলবন্ধনে বিদেশি মুসলমান আতঙ্কবাদীদের অর্থসহায়তায় গড়ে উঠছে একের পর এক বেআইনি মাদ্রাসায় জঙ্গি তৈরির গুপ্ত কারখানা। বিপুল অর্থ সাহায্য আসছে সিরিয়া, মিশর, লেবানন, তুরস্ক সৌদি আরব, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া থেকে। তবে ভিন্ন পথে ভিন্ন দেশের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ভিন্ন স্থানে প্রেরিত অর্থ থেকেই এদের সামগ্রিক উদ্দেশ্য ধর্মের নামে জেহাদি প্রশিক্ষণ দেওয়া। আর সেটা সম্ভব হচ্ছে শিক্ষার নামে মাদ্রাসার অভ্যন্তরে। মুসলমান মাত্রেই জঙ্গিবাদী, মাদ্রাসা মাত্রেই যে জঙ্গি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তা কিন্তু নয়। বিদেশি অর্থের সিংহভাগ টাকাই কিন্তু মসজিদগুলোর ধর্মান্ধ মৌলবিদের কাছে আগে পৌঁছচ্ছে। আর এই সমস্ত মৌলবিরা ধর্মান্ধ শুধু নয় পৃথিবীর আর কোনো বই না পড়ে শুধুমাত্র আংশিক কোরান-হাদিসের অনুবাদ পড়ে বিধর্মীদের 'কোতল করে স্বধর্ম প্রতিষ্ঠাতে জীবনহানিতে তৎপর। বিশিষ্ট মুক্তবুদ্ধির 'চির সজাগ প্রহরী' আবুল ফজলের ভাষায়— 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'। এরাই সেই অমানবিক-বৃদ্ধ-আড়ষ্ট ধর্মান্ধ ধর্মাচরণের বিষাক্ত কেউটে জীব। এদের অন্তর্জাত মনুষত্ববোধ, দয়া-মায়া, বিবেক-বোধ সব সঙ্কীর্ণ স্বধর্মের গণ্ডিতে বাধা।

শিমুলিয়া মাদ্রাসার পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকছে তদন্তকারী দল।

> "শুধু বর্ধমান নয়, দেশবিরোধী এই কার্যকলাপ অত্যন্ত সংগোপনে চলছে মালদহ, মুর্শিদাবাদ, দুই চব্বিশ পরগনা, বীরভূম, জলপাইগুলি, নদীয়া ইত্যাদি সীমান্তবর্তী সব জেলাতেই। ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি'র অভিযানে 'কেঁচো খুঁড়তেই আস্তে আস্তে কেউটে' বেরিয়ে পড়ছে।"

রাজনৈতিক প্রশ্রয়ে ভোট ব্যাঙ্ককে কাছে পেতে এই শতকরা কুড়ি- পঁচিশ ভাগকে টানতে গিয়ে সেই একই প্লাটফর্মে এসে পৌঁছচ্ছে বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদীর অনুপ্রবেশ। সাধারণ সিংহভাগ খেটে খাওয়া সরল নিরীহ হাবাগোবা ছাপোষা সামাজিক মানুষকেও

এরা নানাভাবে বিভ্রান্তির পথে নিয়ে যাচ্ছে। জামাতে ইসলামি, হিফাজত-ই- ইসালামি, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন, আহ্লে হাদিস, আই এস আই এস এদের নাম অধিকাংশ মুসলমান জানেই না। অথবা সম্প্রতি জানছে শুনছে। এরা ভারত তথা পশ্চিবাংলাকে 'নিজের দেশ' বলে ভাবে। এরা সর্বদা স্বাগত। কিন্তু যারা ভারত-পাকিস্তানের খেলায় পাকিস্তানি পতাকা ধরে, বাজি ফাটায় তারা দেশদ্রোহী— ভারতের শত্রু! এটা তো সহজ কথা, সোজা হিসেব।

আজকের ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক প্রশ্রয়ে জীয়ে উঠছে ধ্বংসাত্মক সন্ত্রাসী কার্যকলাপ। যা বর্তমানে আমাদের সকলকে বিশেষভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। বর্তমান সরকারের ঢালাও প্রশ্রয় এবং রাজনৈতিক কারণে মদত দেওয়ায়, সর্বত্র জেহাদি- সন্ত্রাসবাদীদের প্রশিক্ষণখানা হয়ে উঠেছে--- বাংলার আনাচে-কানাচে, গাঁ-গঞ্জের ইসলামিক মাদ্রাসাগুলি। সেখানে পাকিস্তান বা প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে গোপনে 'ট্রেনার' সন্ত্রাসীরা এসে শিক্ষার আড়ালে মুসলমান তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতীদের জঙ্গি প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

বর্তমানে বর্ধমানের 'খাগড়াগড়ে' বিস্ফোরণের তদন্তে নেমে গোয়েন্দারা যে সমস্ত সন্ত্রাসমূলক দেশ-বিরোধী বোমা-গুলি-বারুদের সন্ধান পাচ্ছেন তার 'আঁতুড়ঘর' কিন্তু ওই সমস্ত 'মাদ্রাসা'গুলিই। শুধু বর্ধমান নয়, দেশবিরোধী এই কার্যকলাপ অত্যন্ত সংগোপনে চলছে মালদহ, মুর্শিদাবাদ, দুই চব্বিশ পরগনা, বীরভূম, জলপাইগুড়ি, নদীয়া ইত্যাদি সীমান্তবর্তী সব জেলাগুলোতেই। ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি'র অভিযানে 'কেঁচো খুঁড়তেই আস্তে আস্তে কেউটে' বেরিয়ে পড়ছে।

আসলে যত্রতত্র গজিয়ে উঠছে ব্যাঙের ছাতার মতো বাংলার সর্বত্র এই সমস্ত মাদ্রাসা। যার অধিকাংশই অ-নথিভুক্ত। সেখানে নজরদারিরও কোনও ব্যবস্থাপনা নেই। বিশেষ করে সরকারি পরিদর্শক যাঁরা, তাঁরাও তো মুসলমান। সবাই না হলেও বেশিরভাগই দীর্ঘকাল ধরে হালছাড়াভাবে আছেন। এরকম মাদ্রাসাগুলিতে নির্বিবাদে চলছে জঙ্গি প্রশিক্ষণ, অস্ত্র-বারুদ বিস্ফোরকের এলাহি বেআইনি কার্যকলাপ। 'খাগড়াগড়' তদন্তে উঠে এসেছে মালদহ জেলার রতুয়া থানার-ই 'ভাদো' এলাকার দু'টি মাদ্রাসার নাম। বর্ধমানে শিমুলিয়া মাদ্রাসার সঙ্গে এই দুই মাদ্রাসার বিশেষ যোগসূত্রেরও হদিস মিলেছে। এক মালদা জেলাতেই সরকারি নথিভুক্ত মাদ্রাসার সংখ্যা ৮১টি। আর অ-নথিভুক্ত মাদ্রাসার সংখ্যা প্রায় ৪৬০টির মতো। জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কালিয়াচক, রতুয়া, মানিকচক, বৈষ্ণবনগর, পুরাতন মালদা, হরিশ্চন্দ্রপুর প্রভৃতি এলাকায় ছড়িয়ে আছে এই সমস্ত মাদ্রাসাগুলি। এখানে ধর্মীয় শিক্ষার আড়ালে চলে দেশবিরোধী কার্যকলাপ, চলে জঙ্গি প্রশিক্ষণ, চলে নানা মারণাস্ত্র তৈরির কারখানা। এখানে এই সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কত ছাত্র-ছাত্রী পড়ে, কোথা থেকে এসে তারা আবাসিকভাবে থাকে, সেই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর ছবি-ঠিকানা, বা কারা তাদের পড়ায়— তার কোনো হদিসই মিলছে না শিক্ষাদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের কাছে। এন আই এর তদন্তে যে সাতটি মাদ্রাসার নাম উঠে এসেছে 'ভাদো' ও 'সামসি' এলাকাতে, তাতে চলতো বিশেষ বহিরাগত ভিনদেশীদের দ্বারা জঙ্গি বা জেহাদি প্রশিক্ষণ। কুখ্যাত জঙ্গি সংগঠন 'জায়স-ই মহম্মদে'র প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা মাসুদ আজাহার ১৯৯৩ সাল নাগাদ এই 'ভাদো'তেই দীর্ঘদিন শিক্ষকের বেশে গা ঢাকা দিয়েছিল। একটানা ধর্মীয় শিক্ষার আড়ালে চালিয়ে যাচ্ছিল জেহাদি প্রশিক্ষণ ও দেশদ্রোহী কার্যকলাপ। সেবার একটুর জন্যে হাত ফসকে গোয়েন্দাবাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে পালায় মাসুদ আজাহার। পরের বছর ১৯৯৪ সালে জম্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গিকাজকর্ম চালানোর জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে মৌলানা আজাহার মাসুদ। সে সময় হরকাত-এ উল-আল্-জেহাদ ইসলামি জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কীরকম কায়দা করে হাইজ্যাক করে ১৯৯৯ সালে ২৪ ডিসেম্বর ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের আই সি ৮১৪ নম্বর বিমানকে আফগানিস্তানের কান্দাহারে নিয়ে গেল জঙ্গিরা ভাবলে অবাক হতে হয়। এও কি সম্ভব? ভারত সরকারকে জঙ্গিদের কাছে মাথা নত করতে হলো শেষ পর্যন্ত। কী-না, বিমান যাত্রীদের মুক্তির জন্য আজাহারকে ছেড়ে দিতে হবে--- তুলে দিতে হবে জঙ্গিদের হাতে। ভারত সরকারের তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী যশোবন্ত সিন্‌হা শেষ পর্যন্ত বাধ্য হলেন— অতগুলো প্রাণের বিনিময়ে দাগি জঙ্গি আজাহারকে ছেড়ে দিতে। এ যে ভারত তথা বিশ্ববাসীর সামনে কীরকম লজ্জার কথা ভাবা যায় না।

তারপর থেকে 'ভাদো' এলাকার সেই বিশেষ মাদ্রাসাটির ওপরে কেন্দ্রের গোয়েন্দাবাহিনী কড়া নজর রাখতে শুরু করে। ২০০৯-এ মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় হাজি শেখ নামে এক হুজি জঙ্গি প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র সহ ধরা পড়ে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তাবাহিনীর হাতে। আসলে মালদা জেলায় প্রায় ১৭১ কিলোমিটার জুড়ে রয়েছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তরেখা। আর তার মধ্যে প্রায় ৮১ কিলোমিটারের মতো কোনো কাঁটাতার নেই। এর মধ্যে আবার প্রায় ৩০ কিলোমিটার জলপথ সীমান্ত। ২০১২ সালে সীমান্ত এলাকার বৈষ্ণবনগর থেকে ভারত-বিরোধী কার্যকলাপের জন্য গ্রেপ্তার করা হয় লস্কর-ই-তৈবার বিখ্যাত এক লিঙ্কম্যানকে। অস্ত্রশস্ত্র এবং জালনোট সরবরাহ করার সঙ্গে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার হদিস মেলে। মালদাকে বেছে নেবার অনেক কারণ আছে। কেননা মুসলমান সেখানে যথেষ্ট সংখ্যায়। তাছাড়া জেলার বুক চিরে চলে গেছে ৩৪নং জাতীয় সড়ক। কলকাতা ও শিলিগুড়ির সঙ্গে উন্নত সড়ক যোগাযোগের ব্যবস্থা। এখানে কালিয়াচক, বৈষ্ণবনগর, মানিকচক, রতুয়া বা হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পশ্চিম প্রান্ত জুড়ে আছে বিস্তীর্ণ ঝাড়খণ্ড ও বিহার সীমান্ত। তাছাড়া রেলের ডিভিসান হওয়ার জন্য দিল্লী, কলকাতা, গৌহাটি, কানপুর, পাটনা, মুম্বই, ব্যাঙ্গালুরু, চেন্নাই-সহ বিভিন্ন শহর-গঞ্জ ও গ্রাম জুড়ে প্রায় চল্লিশ জোড়া ট্রেন দৈনিক এ পথ দিয়েই যাতায়াত করে। একদিকে উন্মুক্ত সীমান্ত অঞ্চল অন্যদিকে যোগাযোগ

ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় মালদা জেলাকে কেন্দ্র করে হুজি, জুম, লস্কর-ই-তৈবা, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন-সহ সমস্ত জঙ্গিগোষ্ঠীর মাধ্যমে মুম্বইয়ের কুখ্যাত 'ডি কোম্পানির সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলছে জালনোট তৈরি ও পাচারের কাজ এবং বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী প্রশিক্ষণ, বিস্ফোরক পাচার, নারীপাচার, অজস্র ভারতবিরোধী কার্যকলাপ। যাকে কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাবাহিনীর কাছে রীতিমতো শক্ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা বাংলা তথা ভারতের মাথাব্যথার বিশেষ একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

বর্ধমানের 'খাগড়াগড়' কাণ্ডের পর, এন. আই. এ-র দল খাগড়াগড়ের বাদশাহী রোড, বাবুরবাগান, মঙ্গলকোটের শিমুলিয়া আউসগ্রাম-সহ মাদ্রাসা এবং একাধিক জঙ্গি ডেরা থেকে যে সমস্ত সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে সে সমস্ত কলকাতায় আনা হয়েছে। এই সমস্ত জঙ্গি কার্যকলাপে মাদ্রাসাগুলিকে বিপুল অর্থ জোগানের উৎস খুঁজতে ইডির প্রতিনিধিদল জানতে পেরেছে যে--- নানাদেশ থেকে বিশেষত পাকিস্তানের বিভিন্ন মুসলমান সংগঠন এবং ব্যক্তিত্ব তাদের ভাণ্ডারে অর্থ যোগান দিচ্ছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের চট্টগ্রামে জনতা ব্যাঙ্কের লালদিঘী শাখার একটি অ্যাকাউন্টে অতি সম্প্রতি এক পাকিস্তানি নাগরিক ২০ কোটি টাকা 'ইসলামি জঙ্গি তহবিলে জমা দিয়েছে। জানা গেছে এই বিশাল টাকার অঙ্ক--- লন্ডনের এক বারক্লেশ ব্যাঙ্ক থেকে পাঠানো হয়েছে।

অ্যাকাউন্টটি খোলা হয়েছে— মাইজ ভাণ্ডার শরিফ শাহ-ই-জামে মসজিদ পরিচালনা ও উন্নয়ন কমিটির নামে। জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে এই মসজিদ কমিটির সভাপতি সৈয়দ নাজিবুল বাশার দাবি করেছেন— কমিটির দুই সদস্য তার এবং আরও এক সদস্যের সই জাল করে এই অ্যাকাউন্টটি নাকি খুলেছিল। ব্যাপারটি ভাবলে অবাক হতে হয়। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে ঢুকে একাধিক জঙ্গিঘাঁটি ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ফেঁদে বসে আছে। কালীগঞ্জ এলাকায় জেলাপরিষদ মার্কেটে জামিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় এবং অন্যত্রও দীর্ঘদিন ধরে যৌন নির্যাতন এবং শিক্ষার্থীদের কট্টর জঙ্গিবাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। সেখানে তাদের শেখানো হচ্ছে— এক আল্লা ছাড়া আর অন্য ঈশ্বরে বিশ্বাসীদের 'খতম' করবার নিষ্ঠুর সব নীতি ও ষড়যন্ত্র।

সম্প্রতি রাজ্যের তৃণমূল প্রশাসন বলছে, 'বিদ্বেষের রাজনীতি নয়--- এখন চাই সম্প্রীতি'। রাজনীতির চাপানউতোর খেলা চলছে। ভোটের জন্য চলছে সংখ্যালঘু তুষ্টি নিয়ে গুষ্টির পিণ্ডি চটকানো। এ খেলা সব দলই খেলছে। 'হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি' কিন্তু সব দলই চায়, কিন্তু সেই সুযোগ নিচ্ছে তো মুসলমান মাদ্রাসার আড়ালে দেশি ভারত-বিরোধী মুসলমান সংগঠনের সঙ্গে বিদেশি জঙ্গি দলগুলির গোদের উপর বিষফোঁড়ার দল। এই সব বিষফোঁড়ারা ছাড়া এক শ্রেণীর ভোট-ভিখারি রাজনৈতিক নেতানেত্রীও তার চ্যালাচামুণ্ডার দল। বুদ্ধিজীবী রাজনীতি সচেতন মুসলমান গণ্যমান্যদের ধারণা— ''মাদ্রাসাগুলিতে জঙ্গি ঘাঁটি তৈরিতে বা সন্ত্রাসের আখড়া করতে এক শ্রেণীর অশিক্ষিত মোল্লা ও মৌলবাদীরা পিষে মারছে সমাজের শিক্ষাহীন, অন্নহীন, অর্থহীন পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের। রাজনীতির সঙ্গে বা স্বার্থে এদের প্রত্যক্ষ মদত রয়েছে। তাঁদের আশঙ্কা— এই মুহূর্তে গোটা দেশে বিশেষ করে এই রাজ্যে যে পরিবেশ পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হচ্ছে তা আমাদের মুসলমান সমাজকে শঙ্কিত করে তুলেছে। এ রাজ্যের ঘটনা গোটা বিশ্বের কাছে মুহূর্তে পৌঁছে যাচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে লালিত সন্ত্রাস-বরিষ্ঠ মুসলিমরা আজকের অশিক্ষিত যুব মুসলমানদের মধ্যে উস্কানিতে চারিয়ে দিচ্ছে। এর পরিণতি ভয়ঙ্কর! একে যে কোনো প্রকারে বন্ধ করা দরকার। সমস্ত নথিভুক্ত অ-নথিভুক্ত মাদ্রাসাগুলিকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করা দরকার। সেই সঙ্গে বর্তমান ও বিগত প্রশাসনের দায়কে নির্দিষ্ট একটা জাতি বা প্রতিষ্ঠানের উপর শুধু চাপালে চলবে না।''

আজকের ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় মূল শিক্ষাস্রোতকেও একই পথে চালিত করা দরকার। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য প্রশাসনকে এ ব্যাপারে সুষ্ঠু সমাধানের পথ বের করতে হবে। মাদ্রাসাগুলিতে কড়া নজরদারি রাখতে হবে। বিশেষ করে যেগুলোতে এই সমস্ত জঙ্গি ও দেশবিদ্বেষী কার্যকলাপ চলছে। কড়া হাতে সেগুলি বাতিল করা দরকার। করেকম্মে খেতে গেলে দেশের মূল ও সার্বিক শিক্ষাস্রোতে তাদের ফিরিয়ে আনতে হবে। রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের সমগ্র দেশ ও মানবজাতির বৃহত্তর মানবতার উন্মেষের দিকে তাকাতে হবে। সন্ত্রাস, জেহাদ ও জঙ্গিপনা প্রতিরোধে শুধু কট্টর ইসলামি শিক্ষা বা সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে কাজে লাগালে চলবে না। দরকার মুক্তবুদ্ধির মানবতাবাদী সজাগ প্রহরী বিশিষ্ট মানবতাবাদী সমাজ চিন্তাবিদ আবুল ফজলের মতো 'মানবতন্ত্র'বাদী দৃষ্টিভঙ্গি। যিনি তাঁর বিখ্যাত 'মানবতন্ত্র' প্রবন্ধে বলেছেন, ''কেতাবের ইসলাম আর জীবনের ইসলামের মাঝখানে আজ বিরাজ করছে এক প্রশান্ত মহাসাগর।'' সেই মহামিলনের মহাসাগরে 'মানুষ' হিসাবে 'মানবতন্ত্র' নিয়ে আজ চলতে হবে। মুসলমান ধর্মে নাকি বলা হয়েছে— 'যারা অ-মুসলমান বা ভিন্নধর্মী তাদের কোতল করতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে লেখক আবুল ফজল 'বিশ্ব মনুষত্ববোধের মহাসাগরে নিক্ষেপ করেছেন। প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ ড. শাহিদুল্লাহ বলেছেন— 'দ্বীনি শিক্ষাই প্রকৃত মৌলিক শিক্ষা।' কিন্তু এই মৌলিক শিক্ষাকেন্দ্র বেসরকারি মাদ্রাসা তথা খারিজি মাদ্রাসাগুলির পঠন-পাঠন, অর্থ ভাণ্ডারের উৎস, জিহাদ সম্পর্কে কোরানভিত্তিক ধারণার প্রযুক্তিগত বাস্তব মূল্যায়ন এখন জরুরি। 'খারিজি' মাদ্রাসাগুলির জন্য সমস্ত মুসলমান বিব্রতবোধ করবে, চিন্তিত হবে, অপদস্থ হবে কেন? দলমত- নির্বিশেষে সরকার ও সকলেই মাদ্রাসা সম্পর্কে সদর্থক ভূমিকা নিয়ে দেশের স্বার্থে জাতির স্বার্থে— সর্বোপরি বিশ্ব মানবতার স্বার্থে কাজ করুক— এটাই তো সকলের কাম্য হওয়া উচিত! ■

রাষ্ট্র, মানবতা ও ধর্মীয় সহাবস্থান-বিরোধী ক্রিয়াকলাপে অনুমোদনহীন মাদ্রাসাগুলি নিষিদ্ধ হোক

একলব্য রায়

কিছু ব্যতিক্রম বাদে অসম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরার মতো উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠীর পরোক্ষ সাহায্য নেওয়াটা এখন গা সওয়া পুরনো রেওয়াজ। কাশ্মীরেও নাকি চলে আসছে একই রেওয়াজ। এই সমস্ত রাজ্যে নির্বাচন এলেই রটে যায়, সবচেয়ে শক্তিশালী জঙ্গিগোষ্ঠীর অদৃশ্য হাত কোন প্রার্থী বা দলের মাথায় আছে এবং তার জয় নিশ্চিত বলে ধরে নেওয়া হয়। বর্ধমানের খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কাণ্ডের পর মিডিয়ায় যে সমস্ত খবর প্রকাশিত হচ্ছে তা থেকে ক্রমেই যেন এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসের সৌজন্যে বঙ্কিম-বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথের এই বাংলা মানবতা-বিরোধী, সভ্যতা-বিরোধী, ধ্বংসাত্মক ক্ষমতার রাজনীতির নিরিখে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির সঙ্গে একই সারিতে স্থান করে নিয়েছে। বলা ভালো কাশ্মীরের সঙ্গে একই সারিতে স্থান করে নিয়েছে। কারণ কাশ্মীর ছাড়া নির্বাচনে জেতার জন্য জেহাদি ইসলামের সাহায্য নেওয়া হয়েছে এমন কথা আমি অন্তত শুনিনি। এই দিক থেকে দেখতে পেলে জেহাদি ইসলাম ও সংবিধানসম্মত ক্ষমতার যোগসাজশের নিরিখে বর্তমান ভারতে কাশ্মীরের পরে পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় রাজ্য। অর্থাৎ লন্ডন সুইজারল্যান্ড নয়, বাংলা এখন জেহাদি কাশ্মীর। তথ্য প্রমাণ সহযোগে প্রমাণিত না হলেও এ রাজ্যের রাজনৈতিক তরজায় একথা অনেকবার শোনা গেছে মমতা নাকি ক্ষমতায় আসার জন্য মাওবাদীদেরও সাহায্য নিয়েছিলেন এবং কাজ হাসিল হয়ে যাওয়ার পর কিষেনজী-কে মেরে দিয়ে ভালো মানুষ সেজে বসে আছেন।

মমতার দলের রাজ্যসভার সদস্য এ রাজ্যে সিমির প্রতিষ্ঠাতা হাসান ইমরান চিটফান্ড সারদার টাকা বাংলাদেশের জামায়েত জঙ্গিদের হাতে তুলে দিয়ে সে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ হাসিনা সরকারকে উৎখাত করতে ও সংখ্যালঘু হিন্দু নিধনে মদত যুগিয়েছেন। এই অভিযোগ আগেই উঠেছে। খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কাণ্ডের পর অভিযোগ উঠেছে হাসিনা সরকারের তাড়া খেয়ে এ রাজ্যে আশ্রয় নেওয়া জামায়েতের সন্ত্রাসবাদীরা তৃণমূল কংগ্রেসকে ক্ষমতায় আনার জন্য প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচনে কাজ করেছে এমনকী অর্থও জুগিয়েছে। বিনিময়ে তারা এ রাজ্যে গড়ে তুলেছে মারণাস্ত্র তৈরির কারখানা ও মাদ্রাসার আড়ালে আত্মঘাতীবাহিনী তৈরির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এই অভিযোগ সত্য হলে বলতে হবে ক্ষমতার জন্য মমতা শুধু মাওবাদী নয় জেহাদি ইসলাম নামক বাঘের পিঠেও সওয়ার হয়েছেন। বাঘের পিঠে ওঠা সহজ কিন্তু নামা সহজ নয়। ইন্দিরা গান্ধীর মতো নেত্রীও ক্ষমতার জন্য চেপেছিলেন 'খালিস্থানী বাঘেদের' পিঠে, কিন্তু নামতে পারেননি।

গত ২ অক্টোবর বর্ধমানের খাগড়াগড় বিস্ফোরণের পরের ঘটনাক্রম বলছে মমতা সরকার এই ঘটনাকে লঘু করে দেখানো, প্রমাণ লোপাট করা, জামায়েতের জেহাদি ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে একটি বাক্যও ব্যয় না করে কেন্দ্রবিরোধী তোপ দেগে যাচ্ছে। এন আই এ তদন্ত নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ভঙ্গের অভিযোগ আনছেন। মমতার এই আচরণের একটিই উদ্দেশ্য হতে পারে জেহাদি ইসলামকে এ রাজ্যের বৃহত্তর মুসলমান সমাজের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে কেন্দ্রকে মুসলমান-বিরোধী প্রমাণ করে মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক অটুট রাখা। মমতার এই অপপ্রয়াস যে শুধু এ রাজ্য নয় সমগ্র মানব সমাজকে ভয়ঙ্কর পরিণামের দিকে একধাপ ঠেলে দেবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ, খাগড়াগড় বিস্ফোরণ, বিভিন্ন খারিজি মাদ্রাসার জেহাদি পাঠশালা নিছক তোলাবাজি বা গুণ্ডা বদমায়েসদের সন্ত্রাস নয়। জেহাদি ইসলামিদের এই ভয়ঙ্কর কর্মকাণ্ডের পেছনে রয়েছে নির্দিষ্ট চিন্তা, কাজ ও রাজনৈতিক লক্ষ্য। এই কাজ ও রাজনৈতিক লক্ষ্যই মুসলমান দেশগুলিতে অমুসলমানদের কাফের গণ্য করে সেদেশে বসবাস করতে দেয় না। ভারতের মতো বিশ্বের যাবতীয় অমুসলমান দেশগুলিকে পাকিস্তান আফগানিস্তানে পরিণত করতে চায়। ইসলামিক স্টেট নামক ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর জন্ম দেয় ও এদের কর্মসূচিতে পৌত্তলিকতার প্রতীক বলে কাবাশরিফ ধ্বংস, শিয়া ও অন্যান্য মুসলমান উপসম্প্রদায়কে অমুসলমান বিবেচনা করে অন্য অমুসলমানদের সঙ্গে হত্যা করা বা 'প্রকৃত মুসলমানে' ধর্মান্তরিত করার মতো পরিকল্পনাকে স্থান করে দেয়।

খাগড়াগড় অস্ত্র কারখানার তদন্তভার জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এন আই এর হাতে আসার পর বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের শিমুলিয়া, মুর্শিদাবাদের ডোমকল, লালগোলার মতো রাজ্যজুড়ে একের পর এক অনুমোদনহীন মাদ্রাসায় জেহাদি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও অস্ত্রভাণ্ডারের খবর উঠে আসছে। এই সমস্ত জেহাদি ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন, সিমি, আলকায়দা, আই এস আই-এর সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসছে বাংলাদেশের মৌলবাদী রাজনৈতিক দল জামায়েত-সহ জামাতুল মুজাহিদিন, হুজির মতো একাধিক ভূমিগত জঙ্গি সংগঠনের নাম। এখন পর্যন্ত এই সমস্ত ভয়ঙ্কর ক্রিয়াকলাপের পর্দা যতটা উন্মোচিত হয়েছে তা থেকে এটা বলা যায় পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যটি এখন

বারুদের স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

ইসলামের অন্তর্গঠন ও মতাদর্শ যেমন জন্ম দিয়েছে শিক্ষাক্ষেত্রে মাদ্রাসা ব্যবস্থার, তেমনি জেহাদি ইসলামের আদর্শ মোতাবেক মাদ্রাসায় ইসলামের আত্মঘাতী বাহিনী তৈরি করাটাই প্রকৃত ধর্ম। এদের মধ্যে মূলস্রোতের মাদ্রাসাগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি মেনে চললেও খারিজি মাদ্রাসাগুলি মূলত মসজিদকেন্দ্রিক। এগুলিতে কেবল কোরানের পাঠ ও তর্জমা এবং শরিয়তি আদব কায়দা শেখানো হয়। এছাড়াও কিছু মাদ্রাসা আছে যারা দেশি-বিদেশি অর্থ সাহায্যে চলে। কেউ বলেন ধর্মীয় কারণে আবার কেউ বলেন ইসলামিক আবেদনপত্র না আসা এই কথার বড় প্রমাণ। মুসলমানরা নিজেদের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য ও অনুশাসন ধরে রাখার জন্য এটা করতেই পারে এতে অন্যায় কিছু নেই।

কিন্তু এই সমস্ত 'শিক্ষা' প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ যদি দেশের সংবিধান, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, ঐক্য-সংহতি রক্ষাকারি নানা বিধিব্যবস্থার মতো আধুনিক সমাজব্যবস্থার বুনিয়াদি ধাঁচাগুলি রক্ষার পক্ষে বিপজ্জনক হয় তখন কিন্তু রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করার অধিকার আছে। শুধু ভারতে নয়, ইসলামিক দেশগুলিতে এরকম হস্তক্ষেপের রাখা হতো। বাংলাদেশেও মিডিয়ার চাপে পড়ে ২০১২ সালের মে মাসে এক মাদ্রাসা থেকে ৮-১২ বছরের ১৪টি মেয়েকে উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযোগ সকালবেলা সময় মতো নমাজে না যাওয়ার অপরাধে হাতা গরম করে এদের গা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

শুধু ইসলামিক দেশগুলিতে নয় ভারতেও বিভিন্ন মাদ্রাসায় এরকম চরম অমানবিক ক্রিয়াকলাপের উদাহরণ আছে। যেমন ২০১০-এর ১১ এপ্রিল তহেলকা ম্যাগাজিনে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ছদ্মবেশী সাংবাদিকরা বিভিন্ন সময়ে দিল্লীর পাঁচটি মাদ্রাসায় প্রবেশ করে

রাজনৈতিক চেতনার বিশুদ্ধতা ধরে রাখার জন্য। পৃথিবীর কোনো দেশেই এই সমস্ত মাদ্রাসা-মক্তব কখনোই সরকারি দাক্ষিণ্য ও স্বীকৃতির প্রত্যাশা তো দূরের কথা সরকারি স্পর্শ এড়িয়ে চলার সর্বাত্মক প্রয়াস চালায়। মমতার পক্ষে দশ হাজার মাদ্রাসার ঢালাও স্বীকৃতিও ঘুরপথে হলেও নানা অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দেওয়ার পরও শ'খানেকের বেশি উদাহরণ আছে। যেমন, মিডিয়ার চাপে পড়ে ২০১১ সালের ডিসেম্বরে করাচির এক মাদ্রাসা থেকে পাকিস্তান পুলিশ ৫৩ জন 'পড়ুয়া'-কে উদ্ধার করে যাদের মধ্যে ৭-৮ বছরের শিশুও ছিল। অভিযোগ, হিংস্র সন্ত্রাসবাদী হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সহনশীলতা বাড়ানোর জন্য ভয়ঙ্কর অত্যাচারের সঙ্গে সঙ্গে এদের অন্ধকার ঘরে পায়ে শিকল পরিয়ে পশুর মতো বেঁধে ঝুলিয়ে মানবতাবিরোধী নানা ক্রিয়াকলাপ জনসমক্ষে আনে। এই রিপোর্ট অনুসারে বিহারে গ্রামীণ এলাকার অত্যন্ত দরিদ্র মুসলমান মহল্লাগুলি থেকে শিক্ষিত করে অর্থ উপার্জনের মতো যোগ্য করে তোলার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়ে ৫ বছর থেকে শুরু করে বিভিন্ন বয়সের শিশু কিশোরকে এই মাদ্রাসাগুলিতে ভর্তি করানো হয়। দিনে দু'তিন ঘণ্টা 'নাম কা ওয়াস্তে' পড়াশুনার জন্য বরাদ্দ রেখে

কখনো বা সেটাও না রেখে পুরো সময় এদের দিয়ে বিস্কুট ফ্যাক্টরি, জরি ফ্যাক্টরি, হিমঘর, মিষ্টির দোকান, পোশাক ফ্যাক্টরি, মহিলাদের কপালে পরার টিপ তৈরির মতো নানা কাজে শিশু শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করে মোটা অর্থ উপার্জন করানো হয়।

এই সমস্ত মাদ্রাসায় শিশুদের যে কতটা অমানবিকতার শিকার হতে হয় তার কিছু দৃষ্টান্তও এই প্রতিবেদনে দেওয়া হয়েছে। যেমন, বিহারের মাধোপুরা থেকে দিল্লীর শেখরপুর বস্তি এলাকার একটি মাদ্রাসায় নিয়ে আসা একটি ছেলেকে মিষ্টির দোকানে কাজ করানো হয়। সকালবেলা মাদ্রাসা থেকে খালি পেটে বেরিয়ে কাজে আসা শিশুটিকে দোকান মালিক আয়োডেক্স (মালিশের বাম) মাখানো দু'পিস রুটি ও এক কাপ চা খেতে দেয়। ক্লোরোফর্ম সমৃদ্ধ আয়োডেক্স কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে এমনভাবে অবশ করে দেয় যে ছেলেটি সারাদিন যন্ত্রের মতো কাজ করতে থাকে। দিল্লীর বাটলা হাউস এলাকার একটি মাদ্রাসায় উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা ১২ বছরের সাদ্দামকে জরি ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে পাঠানো হয়েছিল। ফ্যাক্টরি মালিক দ্বারা ধর্ষিত হওয়ার পর ক্ষতবিক্ষত সাদ্দাম বিষয়টি মাদ্রাসার মৌলভিকে জানালে মৌলভির সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া ছিল 'মজা আয়া'। ৯ বছরের মহম্মদ আকমলকে বিহার থেকে দিল্লীর একটি মাদ্রাসায় ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল ওরই এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। আকমলকে কাজ করানো হতো টিপ শিল্পে। নতুন অবস্থায় ওর পক্ষে ২০-৩০ প্যাকেটের বেশি টিপ তৈরি করা সম্ভব হোত না। এতে ওই মাদ্রাসার মৌলভি ইফতিকার কাদরি রেগে গিয়ে আকমলকে ঘিরে ধরে সমস্ত ছেলেদের ওর মাথায় থুথু দিতে ও প্রস্রাব করতে বলে। এখন সে দিনে এক'শ প্যাকেট টিপ তৈরি করতে পারে।

রিপোর্ট বলছে এই সমস্ত মাদ্রাসার খরচের জন্য জাকাত (মুসলমানদের ব্যক্তিগত আয়ের ২.৫ শতাংশ তাদের সমাজের উন্নয়নের জন্য দান হিসেবে দেওয়া অর্থ) হিসেবে সাধারণ মুসলমান জনতার দেওয়া অর্থের বেশির ভাগটাই আত্মসাত করে এই সমস্ত মৌলভি। কারণ শিশু শ্রমিক হিসেবে কাজ করার জন্য ওদের খাওয়া দাওয়ার বেশিরভাগটাই কর্মস্থলে হয়ে যায়। ফলে বেঁচে যায় মাদ্রাসার খাওয়ার খরচ। অনেকেই হয়তো বলবেন দু' একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নিয়ে হইচই করার কী আছে। মাদ্রাসা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্য যেহেতু নেই সেজন্য গায়ের জোরে এই সমস্ত ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন বা নিরবিচ্ছিন্ন কোনোটাই বলা যাবে না।

প্রশ্ন হচ্ছে, মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্যতম এই সমস্ত অপরাধের খবর প্রকাশ্যে আসার পরও প্রশাসন সক্রিয় হয়ে উঠেছে এমন খবর নেই কেন? শিক্ষার অধিকার আইন, শিশু অধিকার আইন, শিশু শ্রম আইন, দেশের ফৌজদারি আইনের হাত এখানে পৌঁছয় না কেন? সংবাদমাধ্যম থেকে শুরু করে সচেতন জনসমাজ এই নিয়ে নীরব কেন? মুসলমান সমাজের যারা ধর্ম নিয়ে পান থেকে চুন খসলে রে রে করে ওঠে, তারা মাদ্রাসার মধ্যে ঘটে চলা মুসলমানের উপর মুসলমানের এই বর্বরতা নিয়ে সম্পূর্ণ নীরব কেন? এই নীরবতা কি বিশ্বজুড়ে মাদ্রাসাগুলির গায়ে আলকায়দা, লস্কর, তালিবানের মতো সংগঠনগুলির সন্ত্রাসবাদী নিয়োগ কেন্দ্রের পাশাপাশি শিশু শ্রমিক যোগানদার কেন্দ্রের কলঙ্ক লাগবে এই ভয়ে? কৈলাস সত্যার্থীর মতো শিশুশ্রম বিরোধী নোবেলজয়ীদের দৃষ্টিও এই সমস্ত মাদ্রাসায় পড়ে না কেন? তাহলে কি বলতে হবে যে অনুমোদনহীন মাদ্রাসাগুলিকে ভারতে এস ই জেড-এর (স্পেশাল ইকোনমিক জোন) মতো 'স্পেশাল ইসলামিক জোন' (এস আই জেড) অর্থাৎ দেশের ভিতরে স্বশাসিত দেশ হিসেবে সবাই মেনে নিয়েছে?

২০০২ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য রাজ্যের খারিজি মাদ্রাসার সংখ্যা গননা করার জন্য আইবি (Intelligence Bureau)-কে নিযুক্ত করেছিলেন। রাজ্যের বেশ কিছু মাদ্রাসা দেশ বিরোধী ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত এমন একটি মন্তব্যের পর বুদ্ধবাবু এমন চাপে পড়লেন যে শেষে ঢোক গিলে মিডিয়ার উপর দোষ চাপিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেন। এদিকে আইবি তাদের রিপোর্ট এমনভাবে চেপে দেয় যে রাজ্যের মাদ্রাসা দপ্তর অনেক চেষ্টা করেও সেই রিপোর্ট হস্তগত করতে পারেনি। ১১ সেপ্টেম্বর ২০১২ এর ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের এক প্রতিবেদন বলছে, ক্ষমতায় এসেই মমতাও সেই আইবির দ্বারস্থ হলেন খারিজি মাদ্রাসার সংখ্যা গণনা করার জন্য। হতে পারে মমতার উদ্দেশ্য আলাদা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, শিক্ষা পরিসংখ্যান সংগ্রহের জন্য অজস্র সরকারি পন্থা, পদ্ধতি ও মেশনারি এমনকী মাদ্রাসা বোর্ড নামক একটি পৃথক সংস্থা থাকতে খারিজি মাদ্রাসা নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা গণনা করার জন্য এই বাংলার শাসকদের গোয়েন্দা সংস্থার আশ্রয় নিতে হচ্ছে কেন? মমতা তো মোল্লা মৌলভিদের নিয়ে কমিটি গড়েও মাদ্রাসার সংখ্যা গণনা করানোর কাজটি করাতেই পারতেন। কিন্তু তা না করে গোয়েন্দা সংস্থার হাতে মমতা এই দায়িত্ব তুলে দিলেন কেন? এটা কি গোয়েন্দাদের দিয়ে নতুন নতুন মাদ্রাসা খুলতে মুসলমানদের উৎসাহিত করে দশ হাজার মাদ্রাসার লক্ষ্য পুরণের জন্য? না মাদ্রাসার অবৈধ ক্রিয়াকলাপ নিয়ে তথ্য ভাণ্ডার তৈরির জন্য? না, বুদ্ধ জামানার মতো মমতা জামানার সেই আই বি রিপোর্ট এখনোও দিনের আলো দেখেনি।

এই সমস্ত রিপোর্ট পাওয়া না গেলেও বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য বলছে, কিছু ব্যতিক্রম বাদে এ রাজ্যের বাংলাদেশ সীমান্তের জনচরিত্র পাল্টে যাচ্ছে। বাংলাদেশি ও মুসলমান দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবে হিন্দুরা সীমান্ত এলাকা ছেড়ে আশ্রয় নিচ্ছে নিরাপদ স্থানে। সীমান্ত এলাকায় মসজিদ মাদ্রাসার নামে তৈরি হচ্ছে বড়বড় পাকা বাড়ি। নানা নামে গজিয়ে উঠছে বিভিন্ন এনজিও। কানাঘুষো হলেও এগুলোর অর্থের উৎস এলাকাবাসীর অজানা। কেন্দ্রের এক রিপোর্ট অনুসারে গত আট বছরে এ রাজ্যের বাংলাদেশ সীমান্তে ১৮০০টি মসজিদ এবং অসম ও পশ্চিমবঙ্গ মিলে ১৫০০টি মাদ্রাসা গজিয়ে উঠেছে। সব মিলে বলা যায় শাসন ক্ষমতা ভোগের মতো সঙ্কীর্ণ স্বার্থে বর্তমান বিশ্বে মানব সভ্যতা বিপন্নকারী জেহাদি ইসলামের প্রশ্রয়ের প্রশ্নে বুদ্ধ মমতার মধ্যে কোনো তফাত নেই। বাঙালিকে আরো একবার জেগে উঠতে হবে। শুধু জেহাদি ইসলাম নয়, অস্তিত্বহীন করে দিতে হবে এদের প্রশ্রয়দাতা রাজনীতিকদেরও, না হলে আরো একবার বিপন্ন হবে বাংলা ও বাঙালির অস্তিত্ব। ■

চিঠিপত্র

ভারতবর্ষের অখণ্ডতা

ভারতবর্ষে মুসলমান জনসংখ্যা পৃথিবীতে দ্বিতীয় বৃহত্তম। এই সমাজের আচার আচরণ, রীতি নীতি বহুলাংশে হিন্দুদের থেকে পৃথক। ভারতবাসী মনে করে মুসলমানরা এই সমাজেরই অংশ। কিন্তু সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপার হলো প্রতিবেশী রাষ্ট্রের দিক থেকে ক্রমাগত প্ররোচনা মাঝে মাঝে তাদের অধৈর্য করে তোলে। উগ্রপন্থীরা অল্পশিক্ষিত মুসলমানদের ভাবতে শেখাচ্ছে এ তাদের দেশ নয়। এর অনিবার্য ফল হলো দেশের অখণ্ডতাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেওয়া।

ইংরেজ এবং কংগ্রেসের সম্মিলিত ষড়যন্ত্রে একবার আমরা দেশের অখণ্ডতাকে রক্ষা করতে পারিনি। আবার আমাদের অখণ্ডতা বিপর্যস্ত হবার অশনি সঙ্কেত মাঝেমাঝেই দেখা দিচ্ছে দেশের নানা প্রান্তে। এ বিপদ মোকাবিলা করার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। কেননা যে জাতি ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না তার পতন অবশ্যম্ভাবী। পৃথিবীর ইতিহাসে এর উদাহরণ বড় কম নেই।

দেশ যদি আবার ভেঙে টুকরো টুকরো হয় তাহলে ভারতবর্ষ নামে দেশটার অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আমাদের সুবিশাল জ্ঞানভাণ্ডার, হাজার হাজার বছরের জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার সুযোগ মুহূর্তে মিলিয়ে যেতে দেরি হবে না।

তাই যুবকদেরই এগিয়ে আসতে হবে এই মহান দেশকে নব নব উচ্চতায় তুলে ধরতে।

—দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়,
বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি।

এদেশে মুসলমানরা কি সংখ্যালঘু?

জন্মের পর থেকে এদেশে শুনে আসছি একটি শব্দ 'সংখ্যালঘু'। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ৬৭ বছরেও শুনছি সেই একই শব্দ 'সংখ্যালঘু'। সংবিধানে মুসলমান, খৃস্টান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি সম্প্রদায় সংখ্যালঘু রূপে চিহ্নিত। তবে ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট ও সেকুলারিস্ট রাজনৈতিক দলগুলির কাছে মুসলমানরাই মূলত সংখ্যালঘু হিসেবে বিবেচিত। কারণ তাদের ক্ষমতা দখলের মূল চাবিকাঠিটি রয়েছে মুসলমানদের হাতে। তাই মুসলমান তোষণ তাদের রাজনৈতিক আদর্শের একটি অঙ্গ। তাছাড়া তারা অবহিত যে, মুসলমান ভোট সংগঠিত। সেই সুবাদে যে দল তাদের সুখ, সুবিধা ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি সবচেয়ে বেশি দেবে, তারা দলবদ্ধভাবে সেই দলকেই ভোট দেবে। তাই মুসলমান তোষণ প্রতিটি কমিউনিস্ট বা সেকুলারিস্ট দলের আবশ্যিক কর্তব্যকর্মের মধ্যে পড়ে। তাদের কাছে মুসলমানরা পায় 'জামাই আদর', মুসলমানদের দুঃখে কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণেও তারা পিছপা হয় না।

কিন্তু প্রশ্ন, মুসলমানরা কী আজ এদেশে সংখ্যালঘু? স্বাধীনতা প্রাপ্তিকালে এদেশে মুসলমান সংখ্যা যা ছিল, এত বছরে বৃদ্ধি পায় তা প্রায় ৩০ শতাংশ হয়েছে। কাজেই মুসলমানরা সংখ্যালঘু হয় কোন্ যুক্তিতে? বরং সংখ্যালঘু বললে বলা উচিত খৃস্টানদের। কারণ তাদের সংখ্যা ৪-৫ শতাংশ। আসলে মুসলমানদের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অন্যদের তুলনায় বেশি এবং দৃষ্টিকটুভাবে বেশি। এর কারণও অবশ্য আছে। সংবিধানে হিন্দুদের ক্ষেত্রে যেখানে রয়েছে এক স্ত্রী ও দুই সন্তানের বিধান, সেখানে মুসলমানদের ক্ষেত্রে 'মুসলমান ব্যক্তিগত আইন' অনুসারে চার বিবি রাখার অধিকার আছে একজন মুসলমান পুরুষের। এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের আইন হিন্দুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও মুসলমানদের ক্ষেত্রে ধর্মীয় কারণে ততটা নয়। হিন্দুদের অধিকাংশই জন্মনিয়ন্ত্রণে বিশ্বাসী। তাই হিন্দু পরিবারগুলি ছোট থেকে আরও ছোট হচ্ছে। পক্ষান্তরে, জন্মনিয়ন্ত্রণে অবিশ্বাসী মুসলমান পরিবারগুলি, যাদের সংখ্যাই বেশি, বৃহৎ থেকে সুবৃহৎ হচ্ছে। এর মূল কারণ যেমন অশিক্ষা, দারিদ্র্য, ভোগসর্বস্বতা, অদূরদর্শিতা ইত্যাদি, তেমনি রাজনৈতিকও বটে। তাছাড়া ভারতকে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চলছে আন্তর্জাতিক ইসলামিক চক্রান্ত। সেই চক্রান্তকারীরা একদিকে মুসলমানদের জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ভুল বোঝাচ্ছে ও জন্মহার বৃদ্ধিতে করছে প্ররোচিত, অন্যদিকে মুসলমান অনুপ্রবেশে দিচ্ছে ইন্ধন বা মদত। লক্ষ্য একটাই, ভারতকে 'দারুল হারব্' থেকে 'দারুল ইসলাম'-এ পরিণত করা। কমিউনিস্ট-সেকুলারিস্ট দলগুলি সব দেখে শুনেও চোখ বন্ধ করে মুখে কুলুপ এঁটেছে, ক্ষমতার লোভে, মুসলমান ভোটের স্বার্থে। দেশ ভাগের সময় অসমের এক মুসলমান লিগ নেতা ভারতের মুসলমানদের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'পয়দা করে ফয়দা লোট'। তিনি পাকিস্তানে না গিয়ে এ দেশের কংগ্রেসে ভিড়ে গিয়েছিলেন। অধুনা তিনি মৃত। কিন্তু তাঁর উপদেশের মৃত্যু ঘটেনি। অধিকাংশ মুসলমান তাঁর উপদেশ মনে রেখেছে।

কিছু রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞের অভিমত, এভাবে চলতে থাকলে কয়েক দশকের মধ্যে ভারতে মুসলমানরা হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। ফলে রাষ্ট্রক্ষমতা চলে যাবে মুসলমানদের হাতে। তখন হিন্দুস্থান ইসলামিস্তানে পরিণত হওয়া অসম্ভব নয়। তাই মোদী সরকারের উচিত, সবার জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ আইন বাধ্যতামূলক করা এবং অনুপ্রবেশকারীদের দেশ থেকে বহিষ্কারপূর্বক সীমান্তে কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করা। অন্যথায় হিন্দুস্থানকে বাঁচানো যাবে না। এ ব্যাপারে অবশ্য হিন্দু সচেতনতাও প্রয়োজন। তাই, জাগো হিন্দু জাগো।

—ধীরেন দেবনাথ,
কল্যাণী, নদীয়া।

দাবি

অনুপ্রবেশকারী যারা তারা যাক ফিরে
লুপ্ত হোক ৩৭০ ধারা কাশ্মীরে।

সবার হোক একবিধি গো-হত্যা নিষিদ্ধ
ভারত হোক বিশ্বগুরু রূপে প্রসিদ্ধ।
ভারত হোক হিন্দুরাষ্ট্র, হোক রামমন্দির
জয় শ্রীরাম মন্ত্রে জাগো, জাগো
হিন্দুবীর।

—ড. সুশীলকুমার সরকার,
উত্তর ব্রহ্মপুর, নদীয়া।

গো-পাচার ও জঙ্গি নাশকতা

বাংলাদেশ সীমান্তে গোরু পাচার ও তার থেকে অর্জিত অর্থে ভারতে জঙ্গি নাশকতা চালানোর সম্পর্কে এই পত্র।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক রাজ্যসরকারকে এই মর্মে সতর্ক করে জানিয়েছে যে, প্রতি বৎসর পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা ও মেঘালয় সীমান্ত থেকে বাংলাদেশে ৫০-৬০ লক্ষ গোরু পাচার হচ্ছে। যার আর্থিক টার্নওভার ১৪-১৫ হাজার কোটি টাকা। বাংলাদেশী জঙ্গি গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণাধীন এই অবৈধ কারবারের লভ্যাংশের কমপক্ষে ২০-২৫ শতাংশ জঙ্গি নাশকতামূলক কাজে ব্যয় করা হচ্ছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের হিসাব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তবর্তী ১৪৯টি গ্রামের ৬৮টি স্মাগলিং করিডর গো-পাচারের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এসব করিডরে সীমান্তরক্ষীবাহিনীকে দিনরাত টহলদারি বাড়াতে বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১৯৯৩ সাল থেকে বাংলাদেশ সরকার এই গো-পাচার ব্যবসাকে আইনগত স্বীকৃতি দিয়েছে গোরু প্রতি ৫০০-১০০০ টাকা কাস্টমস পেনাল্টি ও 'গোরুগুলি সীমান্ত পার হয়ে ঘোরাঘুরি করছিল' এই লিখিত মুচলেকার পরিবর্তে। এই অবৈধ গো-পাচার ব্যবসা থেকে বাংলাদেশের সরকার বছরে ৫০ লক্ষ মার্কিন ডলারও আয় করছে।

জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে জরুরি ভিত্তিতে ভারত সরকারের বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে অনুপ্রবেশ, জঙ্গি নাশকতা ও গোরু পাচার ইত্যাদি সমস্যার সমাধান অবিলম্বে করা উচিত।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, বিজেপি-র গত নির্বাচনী ইস্তাহারে প্রস্তাবিত প্রকল্প অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে 'গোকুল গ্রাম' নাম দেশী গোরু সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও জেনেটিক উন্নয়নের বহুমুখী গো-কল্যাণকেন্দ্র স্থাপনা-সহ রাষ্ট্রীয় গোকুল মিশন নামক প্রকল্প উদ্বোধন করতে চলেছে, গোরু পাচার রোধে যা অত্যন্ত সহায়ক হবে।

—অমর নাথ দে,
কলকাতা-৯।

ট্রেনের সময় পরিবর্তনে যাত্রীদের দুর্ভোগ

রাণাঘাট থেকে লালগোলাগামী ডি এম ইউ লোকাল আগে সকাল ৭-৪৫ মিনিটে রাণাঘাট থেকে ছাড়ত। সেপ্টেম্বর ২০১৪-র সময় সারণীতে ট্রেনটির রাণাঘাট থেকে ছাড়ার সময় পরিবর্তন করে সকাল ৬-৫৫ মিনিট করা হয়েছে। সময়-সূচির পরিবর্তনের ফলে যেসব যাত্রী শিয়ালদা বা মধ্যবর্তী স্টেশন থেকে সকাল ৫-০৫ এর রাণাঘাট লোকাল বা ৫-২০-র কৃষ্ণনগর লোকাল ধরে রাণাঘাট পৌঁছে ডি এম ইউ লালগোলা লোকাল ধরতো, তারা আর তা পারছে না। এর ফলে নিত্য যাত্রীদের দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে এবং গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে বিলম্ব হচ্ছে। অগণিত যাত্রী সাধারণের অসুবিধার কথা চিন্তা করে রাণাঘাট-লালগোলা ডি এম ইউ লোকালের পূর্বের সময়-সূচি ফিরিয়ে আনার জন্য পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করছি।

—সপ্তর্ষি ঘোষ,
৫৭ পটলডাঙ্গা স্ট্রিট, কলকাতা-৯।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

প্রতি কপি মূল্য ১০.০০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

পর্ব-২৫

শ্রীচৈতন্য পরবর্তী যুগের নতুন ধারার মন্দির

বাংলার মন্দিরে মন্দিরে

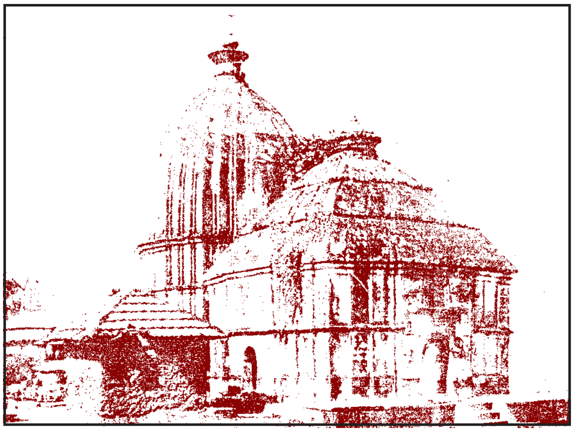

নেড়াদেউলের কামেশ্বর মন্দির

ড. প্রণব রায়

'নেড়াদেউল' নামে প্রসিদ্ধ স্থানটি আসলে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশপুর থানার অন্তর্গত কুঁয়াই গ্রামে। এই গ্রামের দু'টি অংশ— উপর কুঁয়াই ও তলকুঁয়াই। 'নেড়াদেউল' এই সুপরিচিত মন্দিরটি উপর কুঁয়াই অংশে অবস্থিত। এটি কামেশ্বর শিবের মন্দির। দেউলটি প্রাচীন বর্ধমান-জগন্নাথ রাস্তার পাশেই অবস্থিত। এই পাকা রাস্তাটি উত্তর ও দক্ষিণে বহুদূর প্রসারিত। দেউলটিকে 'নেড়াদেউল' বলা হয় এই কারণে যে, এখানে দেউলের শীর্ষে 'আমলক' শিলাটি বহুকাল ধরে স্থানচ্যুত। গর্ভগৃহে কামেশ্বরের যে শিবলিঙ্গ আছে, সেখানে সেই বৃহৎ 'আমলক' শিলাটি বর্তমান লেখক লক্ষ্য করেছেন।

'নেড়াদেউল' বহুবার সংস্কার করা মূল মন্দির ও তৎসলগ্ন প্রশস্ত 'জগমোহন' যুক্ত। কোন্ সময়ে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় তা জানা যায় না। মন্দিরটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই কারণে যে, প্রাচীনকালে এই কামেশ্বর দেউল রাঢ়-বঙ্গ ও ওড়িশার সীমানা নির্দেশ করত অর্থাৎ এখান থেকেই ওড়িশা রাজ্য শুরু হোত। ১৬৬০ খৃস্টাব্দে অঙ্কিত ভন ডেন ব্রুকের মানচিত্রে এই মন্দিরের সঙ্কেতচিহ্ন দেওয়া আছে। তার থেকেই অনুমান করা যায়, মন্দিরটি বেশ প্রাচীন। কিন্তু এখনো মন্দির পরিত্যক্ত হয়নি এবং রক্ষণাবেক্ষণের ফলে মন্দির ও 'জগমোহন' যথেষ্ট অক্ষত। মহাকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় তাঁর কাব্যে ('অন্নদামঙ্গল') (১৭৫৯ খৃস্টাব্দে) লিখেছেন : "বঙ্গের সীমা নেড়াদেউল দেখিয়া'। অতএব এই দেউল যে খুবই ঐতিহাসিক এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

'নেড়াদেউলে'র কামেশ্বর মন্দিরে বিখ্যাত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরায়ের 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর পালাগান হয়েছিল বলে জানা যায়। এই কাব্যে রামেশ্বরের নাম কয়েকবার উল্লেখিত হয়েছে। মন্দিরের কোনো প্রতিষ্ঠাকালীন লিপি নেই। কিন্তু একটি বহুশ্রুত কিংবদন্তী এই মন্দির সম্পর্কেও শোনা যায়। জনৈক দূরদেশের তীর্থযাত্রী এই রাস্তা দিয়ে জগন্নাথধামে যাওয়ার সময় এখানে রাতে যখন নিদ্রামগ্ন ছিলেন তখন স্বপ্নে শিব আদেশ দেন, জগন্নাথধামে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এখানে একটি স্থানে যে শিবলিঙ্গ আছে সেখানে মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেই তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। সেই অর্থবান তীর্থযাত্রী দেখেন, একটি শিবলিঙ্গের মাথায় একটি গাভী প্রতিদিন দুগ্ধ ক্ষরণ করে। মন্দির তারপরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

'নেড়াদেউল' মন্দির ওড়িশি 'শিখর' শৈলীর হলেও শীর্ষ থেকে দেওয়াল নীচের দিকে ক্রমশ ঢালু হয়ে কিছুটা 'চালা'র আকার নিয়েছে। 'শিখর' দেউলের যে সৌন্দর্য শীর্ষভাগে 'আমলক' স্থাপনের ফলে প্রতিভাত হয়, সেটি সম্ভবত সংস্কারের ফলে এই মন্দিরে লক্ষ্য করা যায় না।

মূল মন্দির বা 'বড়দেউল' ও 'জগমোহনে' 'পঞ্চাঙ্গ রাঢ়', 'গণ্ডী' ও 'শীর্ষে'র সুস্পষ্ট বিভাগ এই মন্দিরে এখন লক্ষ্য করা যায় না। 'জগমোহনে'র ভিতরের ছাদ পলেস্তরায় ঢাকা ও চতুষ্কোণাকৃতি। ওপরের বাইরের চাল তিনটি স্পষ্ট ভাগে বিভক্ত, কিন্তু 'চালা'র ভাবটি প্রকটিত। এখানে প্রবেশ ও বহির্গমন পথ আছে।

এই মন্দিরের চার পাঁচ কিলোমিটার পশ্চিমে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণভূমের জমিদার বাঁকুড়া রায়ের রাজধানী আড়রাগড়। এখানেই কবি আনুমানিক ১৬০০ খৃস্টাব্দে তাঁর সুবিখ্যাত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। কাব্যটি খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবিরূপে মুকুন্দরাম এখানো স্বীকৃত। কেশপুর থানার এই মন্দিরটি এসব কারণে একটি ঐতিহাসিক পুরাকীর্তি এবং যথেষ্ট প্রাচীন।

জীবনানন্দ-জননী কুসুমকুমারী দাশ

রূপশ্রী দত্ত

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় এক দিকনির্দেশক স্তম্ভ ছিলেন কবি জীবনানন্দ দাশ। আধুনিক বাংলা কবিতা তাঁর হাত ধরে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য লাভ করল— এক নতুন দিগন্ত খুলে গেল। জীবনানন্দ তাঁর কাব্যপ্রতিভা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন জননী কুসুমকুমারীর নিকট হতে।

কুসুমকুমারী দাশ (১৮৭৫-১৯৪৮) কবি, লেখিকা ও সমাজকর্মী। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন আলোকপ্রাপ্ত ব্রাহ্ম পরিবারে। কুসুমকুমারীও তাঁর কাব্যপ্রতিভা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন পিতা চন্দ্রনাথ দাশের নিকট থেকে।

কুসুমকুমারী কলকাতা বেথুন স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। ১৮৯৪ সালে, উনিশ বছর বয়সে, সত্যানন্দ দাশের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তিনি দুই পুত্র ও এক কন্যার জননী ছিলেন। পুত্রদের নাম— জীবনানন্দ ও অশোকানন্দ; কন্যার নাম সুচরিতা।

কুসুমকুমারীর কাব্যপ্রতিভার নিদর্শনচিহ্ন ছিল বিভিন্ন পত্র- পত্রিকায়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল— মুকুল, ব্রহ্মবাদী ও প্রবাসী। তিনি বিভিন্ন সংবাদপত্র সংরক্ষণ করতেন। তাঁর বিখ্যাত কবিতা— যেটি আজো অনেক বয়স্ক মানুষের মুখে মুখে ফেরে— তাঁর নাম হলো— 'আদর্শ ছেলে'। তার দুটি পংক্তি এরকম—

'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে—
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।'

গৃহস্থালী কাজকর্ম এবং রচনাদি ছাড়াও সামাজিক কল্যাণমূলক কাজে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতেন। ব্রাহ্মসমাজের মহিলা সদস্য হিসাবে বরিশালের নানা সামাজিক উদ্যোগমূলক কর্মকাণ্ডে তিনি জড়িত ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। ১৩১৯ থেকে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত তিনি মহিলাদের দিবাভাগের প্রার্থনাসভার আচার্যা পদে বৃত ছিলেন। এমনকী, তিনি কখনও কখনও ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সম্মেলনেও আচার্যার দায়িত্বভার বহন করতেন।

তিনি বরিশাল মহিলাসভার সেক্রেটারি ছিলেন। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল মহিলাদের জন্য বহুমুখী কল্যাণকর বিষয়ে উদ্যোগী হওয়া, দরিদ্র কন্যাদের নানাভাবে সাহায্য করা, ধাত্রীবিদ্যায় শিক্ষিত করা, বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রচার ও প্রসারে উদ্যোগী হওয়া। সর্বোপরি, অন্তঃপুরেও মেয়েদের নানা গার্হস্থ্যকর্মে শিক্ষা দেওয়া।

শিশুসৃষ্ট জগতের চিত্র ও শিশুর আশা-আকাঙ্ক্ষার কাব্যরূপ তাঁর হাতে সুন্দরভাবে ফুটেছে। তাঁর 'দাদার চিঠি' ও 'খোকার বিড়ালছানা', 'মুকুল' পত্রিকায় ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। শিশুর ভাষা এখানে জীবন্ত রূপ পেয়েছে। 'দাদার চিঠি'-তে কলকাতায় আগত এক কিশোর তার ভাইবোনকে চিঠিতে জানাচ্ছে, সে তার ফেলে আসা পরিবেশ, সঙ্গী ও মানুষজনের জন্য কতটা অভাব অনুভব করছে। 'খোকার বিড়ালছানা' কবিতায় শিশুর সঙ্গে মনুষ্যেতর প্রাণীর গড়ে ওঠা স্বাভাবিক সুন্দর সম্পর্ক বর্ণিত হয়েছে—

'সোনার ছেলে খোকামণি, তিনটি বিড়াল তার,
একদণ্ড নাহি তাদের করবে চোখের আড়।
খেতে শুতে সকল সময়, থাকবে তারা কাছে,
না হলে কি খোকনমণির খাওয়াদাওয়া আছে?
এত আদর পেয়ে বেড়ালছানাগুলি,
দাদা, দিদি, মাসি, পিসি সকল গেছে ভুলি।
'সোনামুখী, সোহাগিনী, চাঁদের কণা বলে
ডাকে খোকা, ছানাগুলি যায় আদরে গলে।
'সোনামুখী' সবার বড়, খোকার কোলে বসে
'সোহাগিনী' ছোট বেটি বসে মাথার পাশে।
মাঝখানেতে মানে মানে বসে চাঁদের কণা
একে একে সবাই কোলে করবে আনাগোনা।'

ব্যাকুল ধর্মজিজ্ঞাসা ও ঈশ্বরকে প্রিয় সম্বোধনের আবেগ কুসুমকুমারীর 'ধর্ম' কবিতায় পাওয়া যায়।

'কবিতা মুকুল'-এর অন্তর্গত 'সাধনপথে' কবিতাটি তাঁর নিদর্শন।

এক বিন্দু অমৃতের লাগি
কি আকুল পিপাসিত হিয়া,
এক বিন্দু শান্তির লাগিয়া
কর্মক্লান্ত দুটি বাহু দিয়া—
কাজ শুধু করে যায়
অন্তরেতে দুরন্ত সাধনা—
তুমি তার দীর্ঘপথে
হবে সাথী একান্ত ভাবনা।'

■

দুঃখের তিমিরে জ্বলে ওঠা মঙ্গল আলোক

মায়ের মৃত্যুর পর চারপাশ বড় ফাঁকা লাগছিল দেবজিতের। মা অসুস্থ ছিল ঠিকই, কিন্তু এরকম হঠাৎ চলে যাবে ভাবতেই পারেনি। অন্যদিনের মতো অফিস বেরোবার সময় মাকে বলেছিল, 'আসছি। ওষুধ খেয়ে নিও মনে করে।' মা বলেছিল 'সাবধানে যাস। তাড়াতাড়ি ফিরিস।' অফিসে কাজের চাপ ছিল। সাড়ে বারোটা নাগাদ ফোন এলো বাড়ি থেকে। ওর জামাইবাবু প্রশান্ত ফোন করেছিল। জানল মায়ের অবস্থা ভালো নয়। দেবজিৎ তার বসকে জানাতেই তিনি বললেন, 'তাড়াতাড়ি চলে যাও। সাবধানে যেও।' সল্টলেকে কেন্দ্রীয় সরকারের অফিস থেকে বাগবাজারের বাড়ি বেশি দূরের পথ নয়, কিন্তু দেবজিৎ অস্থির হয়ে উঠেছিল। চটপট পৌঁছোতে চাইছিল বাড়ি। সরকারি বাসে চাপল। ফাঁকাই ছিল। জানলার ধারে বসে ভাবছিল, 'সকালে তো ভালোই দেখে এলাম। হঠাৎ শরীর এত খারাপ হলো!' বাসস্ট্যান্ড থেকে দ্রুত হেঁটে বাড়ি পৌঁছোল। পাশের বাড়ির হীরক সুতনু এবং আরও কয়েকজন ছিল। দেবজিৎ বুঝতে পারল বড় রকম কিছু হয়েছে। ওর চোখ ছলছল করছে। ঘরে ঢুকে দেখল বাবা চুপচাপ বসে। মা শুয়ে আছে পাশে। দিদি পাপিয়া কাঁদতে কাঁদতে জড়িয়ে ধরল ভাইকে। বাবা নীরব। ভাইবোন বাবার হাঁটুতে মাথা রেখে কাঁদছিল। দুজনের মাথায় হাত দিয়ে অখিল বললেন, 'বড় তাড়াতাড়ি চলে গেল।'

আত্মীয়স্বজন এবং পাড়ার অনেকেই একে একে হাজির। শোকের প্রাথমিক ধাক্কা সামলে দেবজিৎ সমস্ত কাজ সারছিল। হীরক, সুতনু সবসময় সঙ্গে রইল। প্রশান্তকে দেখতে হচ্ছিল সবদিক। সেও অফিস থেকে চলে এসেছিল। দেবজিতের ছেলে ছ' বছরের সপ্তর্ষি কিছুই বুঝতে পারছিল না। পাশের বাড়ির টুম্পাদিদি তাকে সবসময় কাছে রাখছিল। দেবজিতের দুবছর বয়সী মেয়েকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল পাশের বাড়ির বিজুদি। যিনি সবসময় অন্যের উপকারের জন্যে কিছু-না-কিছু করেন। মাকে নিয়ে দেবজিৎরা গিয়েছিল কাশী মিত্তির শ্মশানঘাটে। বাবা একেবারে চুপচাপ। শুধু বলেছিল, 'তোদের মাকে সাজিয়ে দে।' শ্মশান-যাত্রার আগে প্রশান্ত বলেছিল, 'অনুমতি দিন আমরা নিয়ে যাই।' অখিল বললেন, 'সাবধানে যাও ওকে নিয়ে।'

বাড়ি ফেরার পর বড় কষ্ট হচ্ছিল দেবজিতের। মা এভাবে চলে যাওয়ায় কষ্ট যেন বেশি। পরেরদিন সন্ধেবেলায় সকলে একসঙ্গে বসে দেবজিতরা বলাবলি করছিল মায়ের কথা। প্রশান্তর বন্ধু সুমন্তর বউ ঋতা এসেছিল।

পাপিয়া বলল, 'ঋতাদি একটা গান গাও।' ঋতা একটু ভেবে নিয়ে গাইতে শুরু করল। ঘরে অনেকে। ঋতা গাইছিল রবীন্দ্রনাথের গান। দেবজিতও জানে ঋতাদি শুধু রবীন্দ্রনাথের গান গায়। ঋতা গাইছিল : 'দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল আলোক/ তবে তাই হোক।/ মৃত্যু যদি কাছে আনে তোমার অমৃতময় লোক/ তবে তাই হোক।/ পূজার প্রদীপে তব জ্বলে যদি মম দীপ্ত শোক/ তবে তাই হোক।' ঋতা চোখ বুজে গাইছিল। গানের কথাগুলো সকলের মনের গভীরে পৌঁছে যাচ্ছিল। দেবজিৎ একমনে শুনছিল। ঋতা পৌঁছোল গানের শেষ অংশে : 'অশ্রু আঁখি পরে যদি ফুটে ওঠে তব স্নেহচোখ/ তবে তাই হোক।।' ঋতা গানটা গাইল অনেকক্ষণ ধরে। দেবজিৎ দেখল বাবা একমনে শুনছে। চোখ দিয়ে জল পড়ছে। সপ্তর্ষিও লক্ষ্য করেছিল, সে বলে উঠল, 'দাদাই তুমি কাঁদছো?' নাতিকে কাছে টেনে বললেন, 'কই না তো?' একটু থেমে ঋতাকে বললেন, 'মা, তুমি গানটা আরেকবার শোনাবে?' ঋতা বলল, 'অবশ্যই।' শুরু করল, 'দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে...।'

প্রশান্তর ছেলে পল্লব গানটা তুলে নিয়েছিল তার রেকর্ডারে। রাতে গীতবিতান খুলে গানটা পড়ছিল দেবজিৎ। প্রতিটি শব্দ যেন বেছে বেছে সাজানো। মনে হচ্ছিল এ গান তার জন্যই লেখা। আগ্রহ নিয়ে কয়েকটা বই দেখল। গানটা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ১৯৩৭ সালের ২৫ জানুয়ারি। বয়স তখন তাঁর ৭৫ বছর। রবীন্দ্রনাথ নিজে জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছেন। একের পর এক শোক, মৃত্যু আঘাত। সব সামলে নিয়ে নিজের কাজ করেছেন। দেবজিৎ ভাবছিল, জীবন অনেক বড়ো। তা এগিয়ে চলে ক্রমাগত। ধারাবাহিক ঘটনাক্রম। সব কিছুর মুখোমুখি হয়ে জীবনকে জানা। ওই গানটার মধ্যে রয়েছে অনুভবের সত্য, যা মানতে হয়। রয়েছে সান্ত্বনার বাণী। আর আছে গভীর জীবনবোধ। দেবজিৎ গাইছিল 'দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল আলোক তবে তাই হোক।' একান্তে বসে আপনমনে গাওয়া। মা চলে যাওয়ার পর চারপাশ একেবারে শূন্য মনে হচ্ছিল। ওই গানে যেন নতুনভাবে জেগে ওঠার ডাক আছে। মনের গভীরে তা পৌঁছে যায়। মন বলতে থাকে, 'সামনে অনেক কাজ। একে একে সারতে হবে। এগিয়ে চলো।' দেবজিৎ লক্ষ্য করল তার দিদি গানটা গাইছে। বুঝতে পারল ঋতাদির গাওয়ার সময় সমস্ত হৃদয় দিয়ে শুনেছে। সুর তাল লয় বাণী সব ঠিকঠাক মনে রেখেছে। যোগ হয়েছে অন্য আবেগ।

পল্লব তার সিডিটা চালিয়ে দিল। দাদাই বলল, 'গানটা যন্ত্রে ধরে রেখেছিলে দাদুভাই! ভালো কাজ হয়েছে।' এবার পল্লবের অবাক হওয়ার পালা। ঝকঝকে স্মৃতি নিয়ে গানটা গাইল দাদাই।

চিরদিনের লেখা

নবাঙ্কুর

হাতে খড়ি

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(গত সংখ্যার পরের শেষ অংশ)

'মা বিলাসী দাসীকে ডেকে বললেন, 'চৈতনকে বল, তসবির-কামরা খুলিয়ে ঝাড়পোঁছ করিয়ে রাখে, আমি সে ঘরে পূর্ণমাসীকে নিয়ে ছবি দেখাব।' আমি বললেম, 'মা, ছবি লিখতে শেখাবে যে সে থাকবে না?' মা বললেন, 'পরে আসবে শিক্ষক, আগে নিজে নিজে দেখে শিখবে, তারপরে অন্যের কাছে বিদ্যে নিতে যাবে'—'

'আমারও ওই মত, মাসি। তারপর?'

'তারপর তো মায়ের সঙ্গে সঙ্গে বৈকাল উতরে সাজগোজ করে ছবির ঘরে গেলেম। পুরনো বাড়ির সে ঘর তো তুমি দেখনি, অবু—'

'দেখেছি বইকি মাসি, সেই বাড়ির দখিন ধারে লম্বা ঘর, না উত্তর ধারে।'

'না, তাও না, পশ্চিম বারান্দার ঠিক সামনে।'

'সে তো আমাদের পড়বার ঘর ছিল। তাহলে আমি দেখিনি মাসি, তুমি বলো।'

'সে ঘর ছিল যেখানে সেখানটা হয়ে গেছে এখন লোপ, খালি আছে একখানা ভাঙা কপাট ইটখসা একটুখানি দেয়ালে ঝুলে।'

'দেখেছি মাসি, আমি সে জায়গা দেখেছি মনে হচ্ছে। ঠাকুরঘরে ওঠবার সিঁড়ির গায়েই এতটুকু একটি কুলুঙ্গি, তাতে আঁটা একটা কুলুপ দেওয়া দরজা। হরিদাসী তার মধ্যে ঘুঁটে জমা করত।'

'না, অবু, না। আমার মায়ের বাপের বাড়িতে তুমি দেখনি, অবু।'

'জয়নগরের বাড়ি দেখেছি আমি। থেকেছি সেখানে, জন্মেছি সেখানে, তুমিই ভুলে গেছ, মাসি।'

'জয়নগরের বাড়ি তো আমার মায়ের বাড়ি নয় অবু, সেটা তাঁর শ্বশুরবাড়ি।'

'তবে মাসি! আমার মায়ের বাপের বাড়ি ছিল ফুলতলায় রায়দিঘির পাড়ে। এখনও আছে সেটা ভাঙাচোরা অবস্থায় ঝাড়ে-জঙ্গলে ঘেরা। তাহলে আর কেমন করে দেখব, মাসি।'

'হাঁ, তাই বলছিলেম কি সেই পুরনো বাড়ির পুরনো ছবির ঘর— তার দেয়ালে ছবি, ছাতে ছবি, মেঝেতে ছবি; আনাচে কানাচে যে দিকে চাই যে দিকে যাই সে দিকে ছবি ছিল। সেই যন্ত্রের চাবি আমার হাতে দিয়ে মা বললেন, 'এই ঘর রইল তোমার। এই চাবি, এই রঙের বাক্স, তুলি, ছবি আঁকবার যা কিছু দরকার, পাবে। এই আমি এখন দায়-খালাস হয়ে কাশীবাস করি গে যাই'।'

'কাশীবাস কি, মাসি?'

'তা কি জানি, অবু।'

'আমি জানি, মাসি। চৈতন্য বারুইকে চন্দর কবিরাজ বলেছিল, 'চৈতন্য, দিন থাকতে কাশীবাস করো গে।' সেইদিনই পানের বোরজে আগুন ধরিয়ে চলে গেল, আর আসে না। দেখি, তার বউ চন্দর কবিরাজকে ধরে পড়ল। কাশীতে চৈতন্যের খোঁজ করার খরচা আদায় করে ছাড়ে আর কি। এমন সময় বারুই এসে উপস্থিত কাশী থেকে দিব্যি হিরিষ্টপস্ট হয়ে। কাশীবাস করতে গিয়ে লোক প্রায় ফেরে না, ওই একটি মানুষকে দেখেছিলেম ফিরতে।'

'তবে চৈতন্য কি করে ফিরল, অবু?'

'সে এসে বলেছিল সবাইকে, নন্দি ভিরিঙ্গি তাকে ষাঁড়ে চাপিয়ে কৈলেসে সিংগির খোরাক জোগাতে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। মা অন্নপূর্ণার মন্দিরে কিছুকাল কলাভোগ খেয়ে গায়ে যখন বল পেলে তখন রাতারাতি গঙ্গা সাঁতরে উঠল গিয়ে বলরামপুরের রাজার বাড়ি। সেখানে দ্বারপালকে কুস্তিতে হারিয়ে বাহবা নিয়ে ফিরছে দেশে চন্দর কবিরাজকে হাতের কসরত দেখাতে।'

'তারপর কি হল, অবু, চন্দর কবরেজের?'

'তা জানি নে, মাসি। শুনেছি, ওই একটি মানুষ কাশীবাস করতে গিয়ে ফিরেছে, আর কেউ ফেরেনি। তোমার মা তোমাকে ছবিঘরের চাবি দিয়ে ভুলিয়ে কাশীবাস করতে গেলেন, তুমি এমন যে বুঝতেই পারলে না!'

'তোর কথাই ঠিক, অবু, আজ বুঝতে পারছি! আজ এইখানে গল্প থাক, কাল শুনো, কেমন?'

'তাই হবে, মাসি।'

(শেষ)

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

রঙ ভরো

প্রশ্নবাণ

১. কোন্ খাদ্য কখনও খারাপ হয় না, পচে না?

২. ভারতের চিরসবুজ শহর কোথায়? কি নাম শহরের? আগে কি নাম ছিল? অন্য পরিচয়?

৩. ‘ঈশ্বরের আপন দেশ’ ভারতের কোন্ রাজ্যকে বলা হয়? কেন? কোন্ সময় বেড়ানোর পক্ষে সেরা?

৪. রাজ্য হিসেবে কোন্ সালে প্রতিষ্ঠিত কেরালা?

৫. কেরালায় কোন্ কোন্ ভাষা চলে?

উত্তর : ১. মধু। ২. কেরালায়। তিরুবন্তপুরম। ত্রিবান্দ্রম। কেরালার রাজধানী। ৩. কেরালা। প্রকৃতির রূপময় সৌন্দর্যের জন্য। অক্টোবর থেকে মার্চ। ৪. ১ নভেম্বর ১৯৫৬। ৫. মালয়ালাম, ইংরেজি, হিন্দি।

ফিরে পড়া

বাংলার জয়

গুরুসদয় দত্ত (১৮৮২-১৯৪১)

গাহো জয় গাহো জয়   গাহো বাংলার জয়—
দেহে নাহি ক্লান্তি, বুকে নাহি ভয়।।
যার গঙ্গারাঢ়ীর যুগ গরিমা দিগ্-বিজয়ী
সিকেন্দর চিত্তে জাগিয়ে দিল ভয়—
যার রায়বেশে ঢালি সেনা যুগে যুগে রণভূমে
দিল শৌর্যের পরিচয়—
মহা শৌর্যশালিনী সেই বাংলার জয়।
চির শৌর্যশালিনী সেই বাংলার জয়।
হিন্দু-মুসলমান সন্ততি মিলি যার
বিনাশে দৈন্য দুঃখ ভয়
মহা ঐক্যশালিনী সেই বাংলার জয়।
যেথা সততার জয়
যেথা সখ্যের জয়
যেথা সাহসের জয়
যেথা কৃত্য-সাধনে দৃঢ় লক্ষ্যের জয়
সেই বাংলার জয়—
নব বাংলার জয়।
সততার সখ্যের সাহসের ঐক্যের
পরমোৎকর্ষের হেথা পরিচয়—
নব-জাগ্রত সেই বাংলার জয়।
নব-সঞ্জাত সেই বাংলার জয়।
হে খোদাতালা—ভগবান মঙ্গলময়
তব শুভাশিস দাও সারা বাংলায়!

ভগিনী নিবেদিতার নারীজাগরণ

গার্গী মণ্ডল

মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল। উত্তর আয়ারল্যান্ডের ডানগ্যানন নামে ছোট শহরে ১৮৬৭ সালের ২৮ অক্টোবর জন্ম। পিতা স্যামুয়েল রিচমন্ড নোব্‌ল পেশায় ছিলেন ধর্মযাজক। মায়ের নাম মেরী ইসাবেল। মাত্র দশ বছর বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যু ঘটে।

পরিবারের আদর্শের প্রেরণায় মার্গারেটের চরিত্রে সেই সময় থেকেই সত্যনিষ্ঠা, ধর্মের প্রতি অনুরাগ, দেশাত্মবোধ এবং রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ধর্মের প্রতি আকর্ষণের কারণে সেই সম্পর্কে বিভিন্ন বইপত্র পড়ে তিনি সম্যক জ্ঞানলাভের চেষ্টা করেন। কিন্তু কোনো কিছুতেই শান্তি না পেয়ে তিনি ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ছিলেন। এরকম পরিস্থিতির মধ্যেই তাঁর জীবনে আবির্ভাব ঘটল স্বামী বিবেকানন্দের। ১৮৯৫ সালের নভেম্বর মাসে স্বামীজীর এক ভারতীয় বেদান্তদর্শন ব্যাখ্যার অনুষ্ঠানে তাঁর প্রথম দর্শন স্বামীজীকে। সেই সময় বীর সন্ন্যাসীর ধর্মব্যাখ্যা ও ব্যক্তিত্বে তিনি মুগ্ধ হন। তারপর ক্রমশই স্বামীজীর ধর্মজীবনের প্রতি আকৃষ্ট হতে হতে মার্গারেট তাঁকেই গুরু বলে বরণ করে নিলেন। ১৮৯৮ সালের ২৫ মার্চ স্বামীজী মার্গারেটকে দীক্ষা দিলেন। মার্গারেটের নাম রাখলেন নিবেদিতা। যিনি আমাদের সকলের কাছে ভগিনী নিবেদিতা নামে পরিচিত।

শুরু হলো ভগিনী নিবেদিতার ভারতবর্ষের নারী জাতিকে উজ্জীবিত করার কাজ। তাঁর কর্ম কীর্তির উল্লেখ করতে গিয়ে সর্বাগ্রে বলতে হয় নারীশিক্ষা সম্পর্কে। এ দেশের মেয়েদের তিনি জাতীয় ধারায় শিক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন। ১৮৯৮ সালে মা সারদাদেবীর উপস্থিতিতে নিবেদিতা মেয়েদের জন্য প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সেই সময় আনন্দে আপ্লুত হয়ে নিবেদিতা লিখেছিলেন : ‘‘ভবিষ্যতের শিক্ষিতা হিন্দু নারীজাতির জন্য শ্রীশ্রী মায়ের আশীর্বাদের চেয়ে আর কোনো মহৎ শুভ লক্ষণ আমি কল্পনা করতে পারি না।’’ দেশের সাধারণ মেয়েদের মধ্যে স্ত্রী শিক্ষার সূত্রপাত নিবেদিতার হাত ধরেই। সেই সময় প্রাচীনপন্থী সমাজের অভিভাবকেরা বাড়ির মেয়েদের পড়াশোনার পক্ষপাতী ছিলেন না। নিবেদিতা স্বয়ং বিভিন্ন পাড়ায় ঘুরে ঘুরে ছাত্রী জোগাড় করতেন। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেলাই, ছবি আঁকা, হাতের কাজও শেখাতেন গুরুত্ব সহকারে। ব্যায়াম করে শরীরচর্চা করতেও উৎসাহ দিতেন। সর্বোপরি সহজাত ধর্মবোধকে জাগিয়ে তোলা এবং ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটানো ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য।

একাধারে তিনি যেমন স্নেহময়ী ছিলেন তেমনি শাসন করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। তিনি তাঁর ছাত্রীদের নিয়মানুবর্তিতার ওপরে খুব জোর দিতেন। তিনি বলতেন— ‘‘ভারতীয় নারীর প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির মূল লক্ষ্য ছিল চরিত্রগঠন।’’ ভারতবর্ষে আসার কিছুদিন পরেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিবেদিতার কাছে প্রস্তাব রেখেছিলেন তাঁর ছোট কন্যাটির শিক্ষার ভার নেবার জন্য। নিবেদিতার মতো সুশিক্ষিতা ইংরেজ মহিলাকে উপযুক্ত মনে করেছিলেন তিনি। কিন্তু নিবেদিতা তাঁকে প্রবলভাবে ‘না’ বলে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ‘‘বাইরে থেকে কোনো শিক্ষা গিলিয়ে লাভ কি? জাতিগত নৈপুণ্য ও ব্যক্তিগত বিশেষ ক্ষমতারূপে মানুষের ভেতরে যে জিনিসটা আছে তাকে জাগিয়ে তোলাই আমি যথার্থ শিক্ষা মনে করি।’’ তিনি ভারতীয় মেয়েদের শিক্ষার বিষয়ে জোর দিয়ে বলেন— ‘‘ভারতে মেয়েদের শিক্ষাপদ্ধতি এমন হওয়া উচিত যাতে তারা যথার্থ ভারতীয় নারী হয়ে উঠতে পারে। ভারতের আদর্শগুলি কি এবং কীভাবে তা লাভ করা যায়— শিক্ষার মাধ্যমে তাদের নিজেদেরই এসব হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।’’

নিবেদিতা ভারতে আসার পরই শ্রীশ্রী মায়ের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। মায়ের দেখা পাওয়ার পর ভারতীয় নারীর সম্বন্ধে ধারণা জন্মেছিল তাঁর। আমরা তাঁর জীবন, কর্ম, চিন্তা, ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে খুব একটা অবগত নই। তাঁর আত্মত্যাগের মূল্যও আমরা দিয়ে উঠতে পারিনি যথাযথভাবে। স্বামীজীর এই মানসকন্যাকে ভারতবর্ষের স্ত্রী শিক্ষার নবজাগরণের পথিকৃৎ বললেও কম বলা হয়। বর্তমানে নারী সমাজের ভগিনী নিবেদিতা সম্পর্কে অনেক মহামূল্যবান তথ্যই অজানা। অথচ প্রত্যেক নারীর আদর্শের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হওয়া উচিত ভগিনী নিবেদিতা। তাঁর ১৪৮তম জন্মদিনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ভারতের নারী সমাজ যদি ব্যক্তিত্বের আলোকে আলোকিত হয়ে ব্যক্তিত্বময়ী হয়ে উঠতে পারে তাহলে সেটাই হবে উপযুক্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি।

ফিরে দেখা

কংগ্রেসে পরিবারতন্ত্রের জন্মকথা

অতিথি কলম

ইন্দর মালহোত্রা

মনে করে দেখুন ১৯৮০ এর জরুরি অবস্থা পরবর্তী প্রথম নির্বাচনে জিতে দেশের ক্ষমতা হাতে নেওয়ার সঙ্গেই সঙ্গেই কি বোঝা যায়নি ইন্দিরা গান্ধী ও পুত্র সঞ্জয় দেশে বংশানুক্রমিক শাসন জারি করতে কতটা তৎপর? তখনই পরিবারতন্ত্রের বীজ রোপিত হয়ে যায় নি কি? এই সঙ্গে এটাও শ্রীমতী গান্ধী পরিষ্কার করে দিতে দেরি করেননি যে তাঁর অবর্তমানে দেশ ও দলের হাল ধরবেন তাঁরই প্রিয়তম পুত্র সঞ্জয়। অবশ্য তখন কেই-বা ভেবেছিল ১৯৮০'র বিপুল জয়ের মাত্র ছ' মাসের মধ্যেই কি বিপুলতর বিয়োগান্তক ঘটনা শ্রীমতী গান্ধীর পরিবারের জন্য অপেক্ষমান। সঞ্জয়ের এক ইঞ্জিনের উড়োজাহাজের অতর্কিতে ভেঙে পড়া ও তাঁর মৃত্যু কীভাবে শ্রীমতী গান্ধীকে দুমড়ে মুচড়ে দেবে তা বাস্তবিকই ছিল অভাবনীয়।

পরবর্তীকালে অনুসন্ধানে প্রকাশ পায় ওই বিশেষ বিমানটি ভারতে আমদানি করেছিলেন তদানীন্তন গডম্যান ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারী। এই আমদানিও ছিল অত্যন্ত রহস্যের মোড়কে ঢাকা। এই ছোট্ট উড়োজাহাজটি নাকি ব্রহ্মচারীর জনৈক বিদেশিভক্ত তাঁকে উপঢৌকন হিসেবে পাঠিয়েছিল। ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারী তথা গডম্যান প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা ও সঞ্জয় উভয়েরই অত্যন্ত আস্থাভাজন হওয়ার যাবতীয় নিয়মকানুন ভেঙ্গেই প্লেনটি ভারতে আসে। এদিকে বিপর্যয়ের মাত্র এক মাস আগেই তৎকালীন অসামরিক উড়ান ব্যবস্থার ডাইরেক্টর জেনারেল এয়ার মার্শাল জে জাহির তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সঞ্জয় গান্ধীর খামখেয়ালি প্লেন চালানো ও নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করার ফলে তাঁর নিজের ও অন্যদের জীবন সংশয়ের সম্ভাবনার কথা লিখিতভাবে জানাবার চেষ্টা করেছিলেন। এমনকী তিনি ঘটনাটি অত্যন্ত গোপনে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার নজরেও আনতে চান। হায়! ভাগ্যের পরিহাসে এয়ার মার্শালের নোট দেওয়া ফাইলটি 'সব কিছুতে নাক গলানো' সঞ্জয়ের হাতে পড়ে যায়। ফলে যা হবার তাই হয়। দুর্বিনীত সঞ্জয় তাঁর স্বভাব অনুযায়ী সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে সরিয়ে সহকারী G.R. Kathpalia-কে স্থলাভিষিক্ত করেন। অবশ্যই এই ব্যক্তি সঞ্জয়ের বহু আকাশ অ্যাডভেঞ্চারেই বিনা প্রতিবাদে অংশ নিতেন।

এইসব পরবর্তী ঘটনা উন্মোচন অবশ্যম্ভাবী ভবিতব্যের ইঙ্গিতবাহী হলেও ইন্দিরা গান্ধী সঞ্জয়ের মৃত্যু সংবাদে ৩৩ বছরের জোয়ান ছেলের হারানো আর পাঁচজন মায়ের মতোই বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলেন। সঞ্জয় পেছনে রেখে গিয়েছিলেন এক তরুণী বিধবা ও মাত্র তিন মাসের শিশুপুত্র ফিরোজ বরুণকে। ১৯৮০ সালের ২৩ জুন প্রকাশ্য জমায়েতের মধ্যেই শ্রীমতী গান্ধীকে অকাতরে কাঁদতে দেখা যায়। মনে হয়েছিল তিনি হয়ত আর সামলে উঠতে পারবেন না। কিন্তু মাত্র ৪ দিনের মাথাতেই তিনি যখন দপ্তরে হাজির হলেন তখন যাঁরা তাঁকে দেখেছিলেন তাঁদের বিবরণ অনুযায়ী শুকনো চোখের, খাড়া চেহারার এক দায়িত্ববান প্রধানমন্ত্রী। এই ঘনিষ্ঠরাই জানিয়েছেন তাঁর ভেতরে চলছিল অবিরাম রক্তক্ষরণ।

তখনই ইন্দিরা বুঝেছিলেন তাঁর দায় দ্বিগুণ হয়ে গেল। তিনি বেশ টের পাচ্ছিলেন তাঁকে প্রধানমন্ত্রিত্বের সঙ্গে বয়ে বেড়াতে হবে সঞ্জয়ের নানান কুকর্মের প্রেতচ্ছায়া। শুধু তাই নয়, সঞ্জয় তাঁর জীবদ্দশায় দুমদাম করে নির্দয় পদ্ধতিতে তাঁর সহচরদের নিয়ে যে সব কীর্তিকলাপ রেখে গেছেন তার দায়ও। অনেকে আবার সেই কৃতকর্মের সঙ্গী হিসেবে নিজেদের তাঁর (সঞ্জয়ের) যথাযোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে দাবিদার হওয়ার কথা ভাবছেন।

তবে হ্যাঁ, সঞ্জয়ের অকালমৃত্যু তাঁকে তখনই একটা ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব করেনি যে সঞ্জয়ের দাদা রাজীবই হবে তাঁর মৃতপুত্রের উত্তরসূরি। রাজীবই হবে তাঁর উপদেষ্টা ও মরণোত্তর উত্তরাধিকারী। তখনই কিন্তু দেশবাসীর কোনো সন্দেহ ছিল না রাজীবের আসন্ন অভিষেক নিয়ে। কিন্তু সমস্যাটা ছিল অন্য জায়গায়। রাজনীতির বিচরণক্ষেত্রে রাজীব ছিলেন অত্যন্ত অনিচ্ছুক ব্যক্তি। এক সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক মানুষ যিনি নিজের ইতালীয় স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে ছিলেন পরিতৃপ্ত। তিনিও ভাইয়ের মতো অবশ্যই ভালবাসতেন প্লেন ওড়াতে কিন্তু নিয়ম মেনে। তখন তিনি ছিলেন ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের এক পুরোদস্তুর বাণিজ্যিক পাইলট। এই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর অনুগামীরা ভয়ঙ্করভাবে রাজীবকে রাজনীতির বাজারে নামানোর ব্যাপারে তাঁকে চাপ দিতে শুরু করে। দরকার হলে শ্রীমতী গান্ধী যেন বাধ্য করেন এমন একটা আবহ তারা তৈরি করেছিল। রাজীবের এই ঔদাসীন্যের কারণই তাঁর রাজনৈতিক পরিসরে প্রবেশের সময়টিকে দীর্ঘায়িত করতে থাকে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছিল স্ত্রী সোনিয়ার ঘোর বিরোধিতা, তখনকার সোনিয়া রাজীবের রাজনীতিতে আসার তীব্র বিরোধী ছিলেন। তিনি রাজীবকে নিরস্ত করতে ভয়ঙ্কর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। অবশ্য তিনি শেষ অবধি রাজনৈতিক পরিসরে ঢুকতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু এই দীর্ঘসূত্রতা অন্য আর এক সমস্যার জন্ম দেয়।

সময় গড়িয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঞ্জয়ের বিধবা পত্নী মানেকা তাঁর অভিলাষকে বাস্তবায়িত করতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। তিনি জানালেন সঞ্জয়ের বৈধ উত্তরাধিকারী তিনিই। এই অধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি কোনো

চেষ্টার কসুর করবেন না। তিনি সরাসরি রাজীবকে রাজনীতিতে নিছক কচি ও অপরিণামদর্শী বলে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। ইতিমধ্যে সঞ্জয়পন্থী সাঙ্গপাঙ্গরা অনেকেই মানেকার পেছনে মদত দিতে শুরু করেছে যাতে সঞ্জয়ের আমলের ‘পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা’র প্রভাব প্রতিপত্তি তারা অটুট রাখতে পারে। এই ঘটনার আঁচ পেতে দেরি হয়নি ইন্দিরার। যদিও রাজীব আসতে নিমরাজি হয়েছিলেন আর মানেকাও তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা নিয়ে তুমুল বিক্ষোভ করেছিলেন। এই পরিস্থিতিতে শ্রীমতী গান্ধী সঞ্জয়ের অনুচরদের ডানা ছাঁটতে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে তাদের প্রধানমন্ত্রী আবাসে ঢোকা বন্ধ করে দেন এবং যে ছিটেফোঁটা ক্ষমতা তাদের হাতে ছিল তাও পত্রপাঠ কেড়ে নেন। এই সঞ্জয়পন্থীদের ছাঁটাই প্রক্রিয়ার অন্তিম পরিণতি ঘটে যে দিনটাই, সেদিনই জ্যাকেট ছেড়ে রাজীব চিরাচরিত কংগ্রেসী কুর্তা পাজামার অবতারে অবতীর্ণ হলেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জুন ১৯৮১-তে তিনি ভাইয়ের আমেথি কেন্দ্র থেকেই লোকসভায় নির্বাচিত হন যা এখন পুত্র রাহুলের অধিকারে। রাজীবের এই নির্বাচনে মানেকা প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চাইলেও নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা না হওয়ায় তিনি লড়তে পারেননি। তবে এই সময় তাঁর ও শাশুড়ি ইন্দিরার মধ্যে ভাঙন সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল যদিও, তখনও মানেকা প্রধানমন্ত্রী নিবাসেরই বাসিন্দা ছিলেন। এই সময় দিল্লীর অলিন্দে দু'টি জিনিস খুব মুখে মুখে চাউর হোত— (১) ইন্দিরা চান দল ও দেশের হাল তাঁর রক্ত সম্পর্ক অর্থাৎ রাজীবের হাতেই থাকবে, (২) মানেকাকে তাঁর চরম অপছন্দ আর রাজীবের স্ত্রী সোনিয়া তাঁর খুবই প্রিয়পাত্রী।

এদিকে তাঁর নিজের অবস্থান স্পষ্ট করতে মানেকা ইতিমধ্যে গড়ে ফেলেছেন ‘রাষ্ট্রীয় সঞ্জয় বিচার মঞ্চ’। লক্ষ্যপূরণে মানেকা লক্ষ্ণৌতে একটি বিশাল কনভেনশন ডাকার ব্যবস্থা করেন ‘ঠিক তার আগের দিন ইন্দিরার লন্ডন রওনা হওয়ার কথা। তিনি মানেকাকে সমাবেশ বাতিল করতে বলেন। নাছোড় মানেকা রাজি হননি। সেই রাত্রে তুমুল বাগবিতণ্ডার ও পারস্পরিক বিষোদ্গারের মধ্যে মানেকা তাঁর স্বামীর আবাসস্থল ১নং সফদরজঙ্গ রোড ছাড়েন। আর ফেরেননি। এরপর ১৯৮৪ সালে মানেকা তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অবশ্যই রাজীবের বিরুদ্ধে আমেথিতে লড়েছিলেন। মনে পড়বে, এই সময় মা নিহত হওয়ায় রাজীব ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী হয়ে বসেছেন। আর সমগ্র দেশ নিজের দেহরক্ষীর হাতে খুন হয়ে যাওয়া তাদের প্রধানমন্ত্রীর শোক বিহ্বলতায় এক সর্বকালীন সেরা ম্যানডেট দিয়ে কংগ্রেসকে জিতিয়েছিল। পরিবারতন্ত্রের এই পরিধি থেকে মানেকা সেই তিন দশক থেকেই বাইরে আর পরিবারতন্ত্র তার থাবা ২০১৪ পর্যন্ত শক্ত করেছে। এবার হয়ত দিন বদলের পালা।

(লেখক বিশিষ্ট রাজনৈতিক ভাষ্যকার)

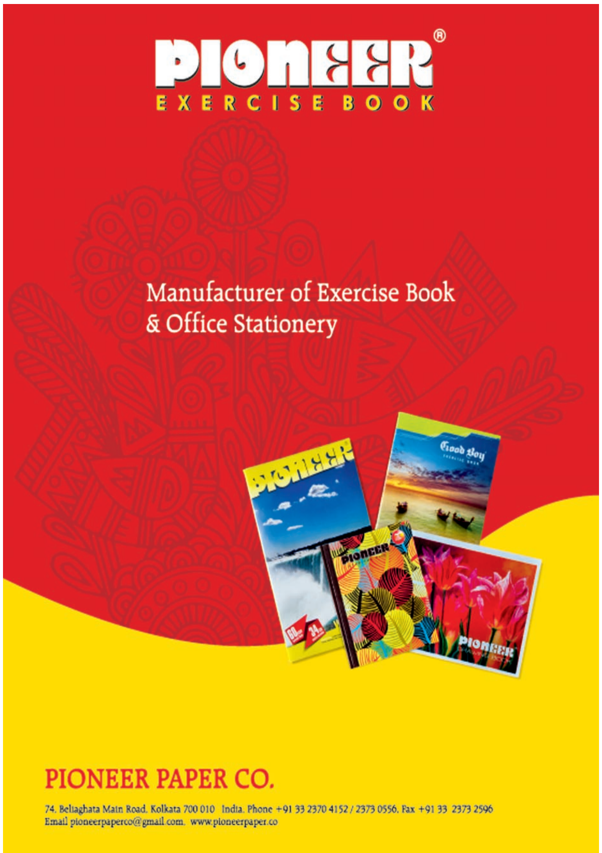

বাংলাদেশে বি এন পি শিবিরের জনবিচ্ছিন্নতা বেড়েই চলেছে

দিলীপ চট্টোপাধ্যায় ॥ ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক পরিস্থিতি সংঘাতময় হয়ে উঠলে তার স্বাভাবিক প্রভাব পড়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা-সহ উত্তর-পূর্ব ভারতে। বাংলাদেশে বর্তমানে ক্ষমতাসীন ও স্বাধীনতাপন্থী শক্তি আওয়ামি লিগের সঙ্গে অদূর ভবিষ্যতে বি এন পি-জামাতে ইসলামিদের সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশের বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বি এন পি বয়কট করায় আওয়ামি লিগের ক্ষমতায় ফেরা সহজ হয়ে যায়। অন্যদিকে পাকিস্তানপন্থী চরম ভারত-বিরোধী তথা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি হিসেবে নিষিদ্ধ জামাতে ইসলামি আবার নিজেদের সংগঠিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। আপাত দৃষ্টিতে বাংলাদেশে বড় বিরোধী চ্যালেঞ্জের সম্ভাবনা দেখছেন না পর্যবেক্ষক মহল। বিএনপি নির্বাচন বয়কট করে যে চরম রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে তার ফল ভুগে চলেছেন খালেদা জিয়া ও তাঁর দল। বাংলাদেশের রাজনীতিতে খালেদা জিয়াই নয়, তাঁদের বিরোধী জোটও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে।

তার ফলে বাংলাদেশের প্রকৃত বিরোধীহীন চলতি সংসদীয় গণতন্ত্রও যথেষ্ট চ্যালেঞ্জের মুখে। সংসদীয় গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থায় রাজনীতি ও প্রশাসনের কেন্দ্র সংসদ থেকে ছিটকে পড়ায় বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ রাজনৈতিক দল বিএনপি বর্তমানে বিপর্যস্ত অবস্থায় রয়েছে। আগে সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিরোধী দলনেত্রী হিসেবে বেগম খালেদা জিয়া দেশে-বিদেশে রাজনীতির আলোচনার কেন্দ্রে ও রাষ্ট্রীয় প্রটোকলের আওতায় ছিলেন। বিদেশি রাজনীতিবিদও কূটনৈতিক শিষ্টাচার নিয়ে প্রায়ই খালেদা জিয়ার সঙ্গে আলাপ আলোচনায় বসতেন। বেগম খালেদা জিয়ার উপদেষ্টারাও নিয়মিতই তাঁদের সঙ্গে নানাধরনের যোগাযোগ, অনুষ্ঠান ও খানাপিনায় যোগ দিতেন। সংসদ অধিবেশন লাগাতার বর্জন করলেও বিরোধী দলীয় নেত্রী ও বিএনপির সাংসদরা যাবতীয় বেতন, ভাতা, বিদেশ সফর, রাষ্ট্রীয় প্রটোকল

পেয়েছেন। প্রশাসনকেও সুবিধামতো ব্যবহার করে নিজ সংসদীয় এলাকার ভালমন্দ বিষয়ে উন্নয়নের কাজও করেছেন। সংসদীয় কমিটিতে অংশগ্রহণ করে দেশের নানা রাজনৈতিক ইস্যু, সরকারি পদক্ষেপ, দুর্নীতি, সরকার দলীয় স্বার্থে সরকারি দলের প্রশাসনকে ব্যবহার এবং সরকারের নানা দুর্নীতি নিয়ে সুপারিশ রেখেছেন।

এ সবই বাংলাদেশে সংসদীয় রীতি-নীতির অন্তর্গত। বিএনপি বাংলাদেশে সংসদ অধিবেশন ক্রমাগত বর্জন করে দলের জন্য কোনো ভালো ফল বয়ে আনতে পারেনি তার দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি; বরং সংসদীয় গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির চর্চা না করে, তাকে উপেক্ষার আসনে বসিয়ে বিএনপি রাজনৈতিক অপরিপক্বতার যে দৃষ্টান্ত রেখেছে তারই জের বহন করতে হচ্ছে খালেদা জিয়াকে। দলের অভ্যন্তরে যে অগোছালো ও অসংগঠিত ছাপ এবং বিদেশিদের স্বার্থে দর কষাকষি ও তাদের নিজেদের পক্ষে টানতে কূটনৈতিক ব্যর্থতার মূল কারণ হচ্ছে যে, সংসদীয় রাজনীতিতে যথার্থভাবে অভ্যস্ত না হওয়া এবং এদিকটিতে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার সংসদীয় জ্ঞান নেই। এর আবির্ভাব সামরিক শাসনের মধ্য দিয়ে এবং প্রেসিডেন্সিয়াল শাসনব্যবস্থার প্রতি দলটির সমর্থন ও দুর্বলতা রয়েছে।

বাংলাদেশে দশম সংসদীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রশ্নে বি এন পি-র রাজনৈতিক কৌশল কূটনীতির অপেক্ষায় ধারণা তাদের জন্য 'কাল' হয়েছে। দেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিএনপি ও তাদের জোট সমর্থকদের বিজয় দলটির বিগত সংসদ নির্বাচনের ব্যাপক সাফল্য সম্পর্কে দেশি-বিদেশি গণমাধ্যম প্রচারও চালিয়েছিল। বিএনপি-র দলের কর্মী সমর্থকদের মধ্যেও জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে চাঙ্গা মনোভাব কাজ করেছিল কিন্তু দলের সুপ্রিমো খালেদা জিয়া এবং বিএনপি হাইকম্যান্ডের নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত যে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রচণ্ড আত্মঘাতী হয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতি দেখে তা অত্যন্ত সহজেই অনুমান করা যায়। বিএনপি তাদের মিত্র রাজনৈতিক দল ও তাদের ঘনিষ্ঠ সুশীল সমাজ নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের যে অযৌক্তিক জেদ নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল তা ছিল বাংলাদেশের সংবিধানবিরোধী। কেননা সুপ্রিম কোর্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি সংবিধানের মৌলিক আদর্শের সঙ্গে বেমানান বলে রায় দিয়েছে এবং কোনোভাবেই সে অবস্থায় ফিরে যাওয়া সম্ভব যে নয় তা এখন সচেতনভাবে সকলেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। বাংলাদেশের দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদে নির্বাচিত রাজনৈতিক দলের

সাংসদদের নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তা ছিল সংবিধানের চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এমনকী বিএনপিকে সংখ্যানুপাতিকের বাইরেও সদস্য সংখ্যা দেওয়ার ইঙ্গিত ছিল; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয় কার কাছে থাকবে অথবা কীভাবে এ সময় বাংলাদেশে সরকার পরিচালনায় কার কতটুকু ভূমিকা ও দায়িত্ব থাকবে তা নিয়ে আলোচনা করার সুযোগও সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার দাবিতে অনড় থাকায় তারা যে রাজনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে তা এখন তাদের সাংগঠনিক দুরবস্থা এবং আন্দোলন গড়ে তোলায় ব্যর্থতার মধ্যেই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। অন্যদিকে কূটনৈতিকভাবেও বিএনপি চরম মার খেয়েছে। আগে বিরোধী দলীয় নেত্রীর যে মর্যাদা, প্রটোকল ছিল তা এখন রওশন এরশাদের কাছে। দেশি-বিদেশি রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিক প্রটোকলে দুই বারের রাষ্ট্র পরিচালনাকারী দল অনেক পেছনে, এটি বিএনপি শীর্ষনেতা এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মনঃপীড়ার কারণ হয়ে রয়েছে। বিএনপি-র অতিমাত্রায় বৈদেশিক রাষ্ট্রের কূটনীতির ওপর নির্ভরশীলতা প্রচণ্ড ক্ষতির কারণ হয়েছে। বিএনপি সুপ্রিমো খালেদা জিয়ার যারা বিদেশনীতির উপদেষ্টা তাঁরা এটা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে, যতই অন্তরঙ্গ মেলামেশা থাকুক না কেন স্বার্থ কিংবা অন্যান্য শর্তপূরণে যতই আন্তরিকতা থাক না কেন, আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুসারে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক ক্ষমতাসীন সরকারের সঙ্গেই যুক্ত এর ব্যতিক্রম সাধারণ হয় না। বাংলাদেশ বিগত আন্দোলনের সময় এবং দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকায় যে সকল ইউরোপীয় কূটনৈতিক দৌড়ঝাঁপ করেছিলেন অশোভন কূটনৈতিক তৎপরতায়, তাঁদের সেসব তৎপরতা সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারকে যে বেকায়দায় ফেলেছে তা এখন স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে।

এসব কূটনীতিক এখন একেবারেই নিশ্চুপ। তাঁদের দেশের সরকার বর্তমান আওয়ামি লিগ সরকারের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠভাবেই কাজ শুরু করে দিয়েছেন। সবচেয়ে ক্ষমতাধর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ড্যান মজিনা সম্প্রতি বলেছেন যে, 'বাংলাদেশে নির্বাচন কবে হবে তা সে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির বিষয়।' এরপর বিএনপি-র কূটনৈতিক পণ্ডিতরা একেবারে চুপসে গেছেন। ভারত, জাপান, চীন রাশিয়া, মালয়েশিয়া, কোরিয়া এবং আরো কিছু দেশ হাসিনা সরকারকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন দেওয়ায় এবং ভারত-জাপান-চীন-রাশিয়ার বিপুল অর্থনৈতিক সহযোগিতার আশ্বাস বৃটেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে। তাঁরা ভবিষ্যতে বাংলাদেশের বড় ভোক্তাবাজার হারানোর আশঙ্কায় এখন ভীত। বিশ্বব্যাঙ্ক এবং আই এম এফ এর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি বাড়ানোয় মনে হয় তারা এ ব্যাপারে হাল ছাড়তে রাজি নয়। বিএনপি সবচেয়ে কূটনৈতিক বেকায়দায় পড়েছে ভারতে নতুন বিজেপি সরকার আসার পর। বিএনপির আশা ছিল ভারতের ক্ষমতার পরিবর্তন বিএনপি-কে ভরসা দেবে, বিজেপি-র বিজয়ে বিএনপি-র মধ্যে এক ধরনের অতিরিক্ত আশাবাদও সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু নয়াদিল্লীর সাউথব্লক, গণমাধ্যম এবং ভারতের জনগণ ভুলে যায়নি যে বিএনপি সুপ্রিমো বেগম খালেদা জিয়া রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের ঢাকা সফরে নির্ধারিত সৌজন্য সাক্ষাৎকারটি হরতালের অজুহাতে বাতিল করে দিয়েছিলেন। বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি যিনি ভারতের প্রথম বাঙালি রাষ্ট্রপতি এবং বাংলাদেশের জনগণে অকৃত্রিম বন্ধু সেই ব্যক্তিত্ব প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক বাতিলের সিদ্ধান্ত যে বিএনপি-র জন্য চরম ক্ষতিকর হয়েছে তা এখন তারা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উক্তি—'বঙ্গবন্ধু দেশ বানিয়েছেন আর শেখ হাসিনা তা রক্ষা করেছেন।'—নিশ্চয়ই খালেদা জিয়া এবং তার উপদেষ্টাদের জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। বিএনপি বাংলাদেশে অনেক ইস্যু থাকা সত্ত্বেও আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। এমনকী যেসব বিষয়ে প্রধান রাজনৈতিক দল হিসেবে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি জনগণকে অবহিত করার কথা তাও করেনি। যুদ্ধপরাধীদের বিচার বিষয়ে দলটির অবস্থান একেবারেই ধোঁয়াশাপূর্ণ। জঙ্গি তৎপরতা নিয়ে তারা অবস্থান স্পষ্ট করেনি, বরং তাদের জোটে এমনসব সংগঠন রয়েছে যারা ইসলামিক জঙ্গিবাদের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে থাকে। জনগণের নিত্যদিনের সমস্যা সঙ্কট নিয়ে স্থানীয়, আঞ্চলিক কিংবা জাতীয় পর্যায়ে তেমন কোনো আন্দোলন তারা গড়ে তুলতে পারেনি। একেবারে সাম্প্রতিক সময়ে ঈদ উল আযহার কয়েকদিন তাদের ডাকা হরতাল ব্যর্থ হয়েছে, দলীয় নেতা-কর্মীরা পর্যন্ত রাজপথে দাঁড়াননি। বিএনপির ঢাকা নগর কমিটি পুনর্গঠিত হওয়ার পর রাজধানীতে সাংগঠনিক অবস্থান আগের চাইতেও দুর্বল হয়েছে। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তৃণমূল থেকে জাতীয় সংসদ পর্যন্ত সকল স্তরে অংশগ্রহণের বিকল্প নেই, কেননা এটিই জনগণকে সংগঠিত করা ও তাদের জীবনের সমস্যা সম্ভাবনার সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ার উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। এবাবে রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের জীবন থেকে রসদ সংগ্রহ করে এবং বেঁচে থাকে। বিএনপি-কেও এ পথে যেতে হবে, এখানে অন্য কোনো শর্টকাট পথ নেই। রাজনীতিতে উত্থাল পতন, ক্ষমতায় যাওয়া, বিরোধী দলে থাকা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, এটা মেনেই রাজনীতিকদের রাজনীতি করতে হবে। বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়।

বাংলাদেশের সরকারি দলকেও এটি বিবেচনায় নিতে হবে যে, গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে হলে এবং অসাংবিধানিক পথে ক্ষমতার পরিবর্তন রোধ করতে হলে গণতান্ত্রিক দলগুলোকে নির্বিঘ্নে কাজ করা ও তাদের বিকশিত করার সুযোগ দিতে হবে। দমন-নিপীড়ন কিংবা মামলা দিয়ে হয়রানি করা গণতান্ত্রিক রাজনীতির পথ নয় বরং নানাভাবে আলোচনা মতবিনিময় ও আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ রেখে বোঝাপড়া ও সমঝোতার ক্ষেত্র তৈরি করাই সঠিক পথ। এতে গণতন্ত্র নিরাপদ থাকে। দেশি বিদেশি গণতন্ত্র বিরোধী ও উগ্রপন্থীরা অশুভ চক্রান্ত চালানোর প্রয়াস চালাতে ব্যর্থ হয়। বর্তমানে যেভাবে ভারত উপমহাদেশ

ও বাংলাদেশকে জঙ্গি তৎপরতার অশুভ ছায়া গ্রাস করেছে, তাতে গণতান্ত্রিক দল জোট ও সংগঠনসমূহের মধ্যে বোঝাপড়া ও ঐক্য স্থাপন আগের যে কোনো সময়ের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে হয়।

বিশ্বাসঘাতকতার ইতিবৃত্ত থেকে বাঙালি জাতিকে শিক্ষা নিতে হবে। শের-ই-বাংলা ফজলুল হক বাংলার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইংরেজ আমলে। ভারত ভাগ হওয়ার পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দরুন পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) হতে বিতাড়িত, অত্যাচারিত ধর্ষিত অমুসলমান নরনারী, শিশুরা বিশেষ করে হিন্দু বাঙালিরা পদ্মাপার হয়ে পশ্চিমবাংলায় আসছেন। সঙ্গে যৎসামান্য বাক্স-তোরঙ্গ নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন তাঁরা। ও নিয়ে তখন ওপারের মুসলমানরা জিজ্ঞাসা করছে যে, হিন্দুরা সঙ্গে করে কি নিয়ে যায়? তখন দুঃখের সঙ্গে হকসাহেব বলেছিলেন এপার বাংলা হতে ওপার বাংলায় হিন্দুরা এপার বাংলার বাক্স-প্যাঁটরা করে বুদ্ধি নিয়ে চলছে।

সত্যই যদি সেই সময়ে পূর্ববাংলা অর্থাৎ অবিভক্ত বাংলা স্বাধীন হোত তাহলে যে কি হোত তা আজ ভাবার সময় হয়েছে। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগ হয়। ১৯৭১-এ বাংলাদেশ পৃথক রাষ্ট্র হয়েছে ঠিকই কিন্তু, আজও সেই বিষাক্ত সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত হতে পারেনি বাংলাদেশ। আজও শেখ হাসিনার চেষ্টা সত্ত্বেও প্রো-পাকিস্তানিরা হিন্দু বিদ্বেষকে সুড়সুড়ি দিয়ে যৎসামান্য যে হিন্দু পরিবার সেখানে আছে তাদের ওপর সমানে নির্যাতন অত্যাচার করে জমিজমা বাড়িঘর দখল করে নিচ্ছে। তাদের রক্ষা করার কেউ নেই। অন্যদিকে দলে দলে জঙ্গি মুসলমানরা পূর্ব সীমানা দিয়ে পশ্চিমবাংলার সীমানা পেরিয়ে এই রাজ্যে ঢুকছে আর এপার বাংলার মুসলমান অধ্যুষিত জেলায় ঘাঁটি গাড়ছে সন্ত্রাস চালাতে ও জঙ্গি মুসলিম সংগঠন গড়ে তুলতে। বর্ধমান কাণ্ডে তা সকলের চোখ খুলে দিয়েছে। বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যে এই অনুপ্রবেশ অত্যাধিক বেড়েছে নানা কারণে। পশ্চিমবাংলার সীমান্ত জেলাগুলোতে ওপার বাংলার লোক দিন দিন বেড়ে চলেছে তারা ওপারে এসে রেশনকার্ড, ভোটার কার্ড সংগ্রহ করছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ধরে। অনেকেই পশ্চিমবাংলা ও বাংলাদেশের ভোটার হয়ে দু'রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে

খালেদা জিয়া

তৃণমূলের শাসনকালে এটা তীব্রতর হয়েছে। বহু দলীয় শাসনব্যবস্থায় ভোটবাক্স ভর্তির ধান্দাটা বড়ই এক দায়। তাই দেশের ভবিষ্যৎ ও বর্তমানে কি দশা হচ্ছে ও হবে সেটা ভাবার এই সব দলগুলোর যেন কোনো দায় নেই। অদ্যাবধি প্রায় ২ কোটি বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারী ভারতে বাস করছে। এ ব্যাপারে নানাভাবে সরকারি দপ্তরে সংবাদ আসা সত্ত্বেও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যেন কোনো দায় দায়িত্ব নেই। সারা দেশ যেন এক অগ্নিকুণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে। যে কোনো সময় বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। গভীর চক্রান্তের শিকার এই সীমান্ত রাজ্যগুলি যেমন পশ্চিমবাংলা, অসম, ত্রিপুরা। তারা সত্যই অসহায়, অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত হয়ে চলেছে। ছিটমহলের মুসলমানরাও পশ্চিমবাংলাকে টুকরো করার চক্রান্ত করে চলছে বেশ কয়েক বছর ধরে। গোর্খাল্যান্ড, বৃহত্তর কোচবিহার, ঝাড়খণ্ডের মধ্যে বনাঞ্চলে পশ্চিমবাংলার কয়েকটি জেলার অন্তর্ভুক্তির দাবি প্রভৃতি। এরা সবাই এক নৌকার যাত্রী। এদের যে সব সহিংস কাজকর্ম চলছে তাদের সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে আই এস আই, জে এম বি, হুজি ও চীনের যোগাযোগ আছে। সেটাও সরকারের অজানা নয়। বর্তমানে চোরাপথে পাকিস্তান, নেপাল ও বাংলাদেশ দিয়ে এদেশে লক্ষ লক্ষ টাকার জালনোট পাচার হচ্ছে। এসব কাজে সক্রিয়রা চিরকালই ভারতের সর্বনাশ চায়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দেওয়ার এক গভীর চক্রান্তের শিকার এই সমস্যা সঙ্কুল দেশ। শুধু প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো ষড়যন্ত্র করছে তা নয়, এর পশ্চাতে রয়ে গেছে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত। যারা বন্ধুর বেশে মীরজাফরের মতো একনাগাড়ে কাজ করে চলেছে। শুধু এই সমস্যা- সঙ্কুল সীমান্ত রাজ্য পশ্চিবাংলার ১৯টি জেলার মধ্যে সংখ্যাতত্ত্বের হিসাব মতে যা নাকি দারুণ গরমিল। অধিকাংশই অনুপ্রবেশকারী। সরকার জেনে বুঝে ও নীরব দর্শক। দিনের বেলায় ওই সব জেলার একরূপ আর রাতে ভিন্নরূপ। মধ্যপ্রাচ্যের পেট্রো ডলারের চোরা স্রোতে মুসলমান অধ্যুষিত জেলাগুলো পুষ্ট হচ্ছে এটাও সরকারের ভালোভাবে জানা আছে। কিন্তু ভোটের বালাই তাদের হাত পা মুখ বন্ধ করে রেখেছে। তাই দেশ চরম সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে চলেছে। বার বার উল্লেখ করা সত্ত্বেও কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। পশ্চিমবাংলার সীমান্ত জেলা যথা দুই ২৪ পরগনায়, মালদহ, দুই দিনাজপুর, কোচবিহারের পথে অনুপ্রবেশকারীরা যাতাযাত করে বেশি। চরম বিপদে দেশের নাগরিকগণ যদি সচেতন না হয় শুধু কয়েকজন পুলিশের কর্ম নয় অনুপ্রবেশকারীদের ঠেকানো। অন্ধহিন্দু বিদ্বেষ আগের মতোই বাংলাদেশে প্রবল। শেখ হাসিনার সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি কিছুই করতে পারছেন না সে দেশে হিন্দুদের নিরাপত্তার স্বার্থরক্ষায়। চট্টগ্রামে প্রো-পাকিস্তানিরা শক্তিশালী হওয়াতে এটি ভবিষ্যতে বাংলাদেশে বিষফোঁড়ার আকার ধারণ করবে যা নাকি ভারতের পক্ষেও ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়াবে।

দূরদর্শী রাজনীতিক ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শরৎ বসু ও সুরাবর্দির বাংলার

পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিকে মানতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি সেই পূর্ণ স্বাধীন বাংলা যাতে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত না হয় সেই প্রতিশ্রুতি দাবি করেন। ষড়যন্ত্রকারী মুসলমান লিগের পৃষ্ঠপোষক সুরাবর্দী সে ব্যাপারে কোনো লিখিত প্রতিশ্রুতি দেননি। তাই সেটা ব্যর্থ হয়। তখন কঠোর পরিশ্রম করে কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাংলার অতি সামান্য এলাকাকে পশ্চিমবঙ্গ নামে বাঙালি অধ্যুষিত এলাকা ভারত যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত করায় সফল হন। তাই ড. শ্যামাপ্রসাদের কাছে এপার বাংলার বাঙালিরা চিরকাল ঋণী থাকবে আশা করি। ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদের অকাল মৃত্যুঘটে কাশ্মীরে শেখ আবদুল্লার চক্রান্তে। তার অদ্যাবধি তদন্ত হয়নি। দুঃখের কথা বিজেপিও সে তদন্ত কাজে এগোয়নি। আর বাঙালিরা তাঁকে প্রায় ভুলেই গেছে। অন্য দিকে কমিউনিস্ট দল বিভক্ত অবস্থায় এই পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বিহারের যুক্ত হওয়ার কংগ্রেসী সিদ্ধান্তকে রুখে দেয় মোহিত মৈত্রের নেতৃত্বে। কিন্তু তারা সর্বনাশ করে গেছে দার্জিলিংয়ের বুকে গোর্খাল্যান্ডের দাবিকে সৃষ্টি করে। সেই বিষফোঁড়া আজ রেড করিডর তৈরি করতে সদাব্যস্ত চীন ও নেপালের মাওবাদীদের দ্বারা।

অন্যদিকে, ভারতের মতো বিশাল দেশে বাজার ও উর্বর মাটি, খনিজ সম্পদ আমেরিকা, চীন, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান রাষ্ট্রগুলি ও রাশিয়ার লোলুপ দৃষ্টি হতে মুক্ত নয়। সত্য কথা বলতে কি এরা কেউই এদেশের প্রকৃত মিত্র নয়। আর এই ভারতের চীন-প্রেমী কমিউনিস্ট ও মাওবাদীরা নিজেদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার স্বার্থে এই বিদেশি চীনের যে ভজনা করছে সেটা ভারতের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সার্বভৌমিকতা, স্বাধীনতার পক্ষে দারুণ ক্ষতিকারক। চীনও ভারতকে টুকরো টুকরো করে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে এক দুর্বল রাষ্ট্রে পরিণত করার ষড়যন্ত্র লিপ্ত। তারা গণতন্ত্রকে বিরোধী, কারণ কমিউনিজম ও মাওবাদীরাও মূলত রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে বিশ্বাসী। তবে এদেশের গণতন্ত্রের মই বেয়ে কমিউনিস্টরা শাসন ক্ষমতা কায়েম করে একদলীয় স্বেচ্ছাচারী শাসন প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। তাই তো পশ্চিমবঙ্গ বামশক্তি সন্ত্রাস ও পেশীশক্তিকে প্রশ্রয় দিয়ে দীর্ঘ ৩৪ বছর শাসনের নামে শোষণ চালিয়ে গেছে। রাজ্যের কল্যাণ ও নিরাপত্তার দিকে তাদের মোটেই দৃষ্টি ছিল না। বিদেশি শিক্ষায় শিক্ষিত বিরাট জমিদার পুত্র যিনি নাকি বাংলা লিখতে জানতেন না সেই জ্যোতি বসু হয়েছিলেন এদেশে কমিউনিস্ট ভাবধারার হোতা। তাঁরই হাত ধরে কমিউনিস্টরা এই হতভাগ্য বঙ্গে বাঙালির কবর রচনা করে গেছে। যিনি কলকাতার মনুমেন্টের পাদদেশে মুসলিম লিগের সমর্থনে দেশভাগকে প্রাধান্য দেন। তিনি পূর্ববঙ্গীয় হয়েও সেখানকার হতভাগ্যদের দুর্দশার কথা ভাবেননি। বরং তাদের মরিচঝাঁপিতে পশুর মতো হত্যা করে কলঙ্কের ইতিহাস সৃষ্টি করে শ্রেষ্ঠ বাঙালি খ্যাতি লাভ করেছেন। এই কঠিন পরিস্থিতি দেশভাগ তথা এই রাজ্য টুকরো করার ষড়যন্ত্রে যারা লিপ্ত তারা যাই হোক না কেন দেশের বন্ধু নয়। অধিকাংশই বিদেশি এজেন্ট। এদের ষড়যন্ত্র আজ ধরা পড়েছে। তাই বীতশ্রদ্ধ জনগণ এই রাজ্যে এক পরিবর্তনের হাওয়া এনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষমতায় এনেছে। ■

লাক্সারী ট্যুরিস্ট লঞ্চে সুন্দরবন ভ্রমণ করুন

সুন্দরবন ভ্রমণের নির্ভরযোগ্য সঙ্গী

বনভূমি ট্রাভেলস্

প্রো : মৃগাঙ্ক রায় (বাপী)

মোবাইল : 9734206040 / 9800684201

অফিস : ক্যানিং রেলওয়ে মার্কেট

ক্যানিং টাউন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

গ্রুপ ট্যুরের ব্যবস্থা আছে

ইমেল : banbhoomitravels@gmail.com

‘সাইবার স্পাইং’ : আধুনিক যুদ্ধের নতুন কৌশল

দেবাশিস আইয়ার

সম্প্রতি ভারতীয় বায়ুসেনা (IAF)-র পক্ষে একটি নির্দেশিকা জারি করা বলা হয়েছে, চীনা মোবাইল সেট (বিশেষ করে XIAOMI গ্রুপের কোনো মোবাইল) কেউ যেন ব্যবহার না করে। সমস্ত সংবাদমাধ্যমে খবরটি বের হয়। আই এ এফ-র ইন্টালিজেন্স রিপোর্টে জানা গেছে XIAOMI গ্রুপের ফোন থেকে গ্রাহকের বিভিন্ন ব্যক্তিগত তথ্য চীন সরকারের তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তরের একটি বিশেষ সার্ভারে পৌঁছে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে তাইওয়ান সরকারের পক্ষেও ফোনের মাধ্যমে চীনা নজরদারি চালানোর বিষয়ে তাদের অধিবাসীদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

XIAOMI গ্রুপ-কে চীনের অ্যাপেল বলা হয়। চীন তার দেশে গুগল বা অ্যাপেলের মতো আমেরিকান কোম্পানির বিরুদ্ধে নানারকম প্রতিবন্ধকতা চাপিয়ে রেখেছে। অথচ চীন তার দেশের মোবাইল জায়ান্ট XIAOMI গ্রুপ-কে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে চাইছে। সেই জন্য তারা মূলত নির্ভর করছে অনলাইন শপিং-এর। ফ্লিপকার্ট বা আমাজনের মতো অনলাইন শপিং পোর্টালের সাহায্যে XIAOMI গ্রুপ তাদের বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক্স আইটেম সারা ভারত ও দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দিচ্ছে। XIAOMI গ্রুপ এখনও অবধি বাজারে মূলত দু'টি মোবাইল সেট নিয়ে এসেছে। Redme 1s এবং MI3. মডেল দু'টি ওরা অনলাইন প্রি-রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতিতে বিক্রি করছে।

অর্থাৎ এই ফোন দুটো কিনতে গেলে আগে থেকে এদের ঠিক করা নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে গিয়ে গ্রাহককে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। এরপর এদের মধ্যে থেকে কিছু গ্রাহককে এরা সিলেক্ট করে ফোনটি পাঠাবে। আর এখানেই সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থেকে যায়। তবে কি ওরা ইচ্ছা করেই ভারতের বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন লোককে এই মোবাইলটি বিক্রি করে তার মাধ্যমে সারা ভারতে ওদের স্পাইং নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে দিতে চাইছে? আই এ এফ-এর সাম্প্রতিক নির্দেশিকায় সেই সন্দেহ যেন আরও পুষ্ট হলো— সাইবার স্পাইং।

সারা ভারত জুড়ে চীন তাদের Cyber Surveillance-এর জাল প্রবল ভাবে ছড়িয়ে যাচ্ছে। বিভিন্নভাবে তারা মাঝে মধ্যেই হ্যাকিং-এর মাধ্যমে আমাদের মিলিটারির গোপন তথ্য-ভাণ্ডারে ঢুকে পড়ছে এবং চুরি করে নিচ্ছে অনেক গোপন নথি। পাকিস্তান যেভাবে মাঝে মাঝে অনৈতিক ভাবে আমাদের সীমা লঙ্ঘন করে সীমানা দখল করতে চায় তেমনি ভাবে চীনের এই সাইবার সীমা দখলও বেআইনি এবং আরও মারাত্মক।

যদিও Cyber Surveillance তথা Global Surveillance-এর এই খেলা শুরু করেছিল আমেরিকা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরই তারা রাশিয়ার ওপর নজর রাখার কারণে এক বিশেষ নজরদারি ব্যবস্থা শুরু করে, যা পরে ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় আরও বিস্তৃতি লাভ করে। এই সময় (৭০ এর দশকে) তৈরি হয় 'Five Eyes' (FVEY) বা পঞ্চ-চক্ষু গ্রুপ। এই গ্রুপটি হলো ৫টি দেশের বিভিন্ন ইন্টালিজেন্স এজেন্সির অ্যালায়েন্স। এর বিভিন্ন দেশগুলি হলো— ইউ এস এ, ইউ কে, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড। এরা মিলিতভাবে সন্দেহজনক দেশ ও ব্যক্তিদের প্রতি নজরদারি চালাতো। এদের নজরদারি থেকে রেহাই পায়নি চার্লি চ্যাপলিন, নেলসন ম্যান্ডেলা থেকে বৃটিশ যুবরাণী ডায়ানা পর্যন্ত। পরবর্তীকালে এদের এই Global Surveillance Programme নতুনভাবে Cyber Surveillance-এর আকার নেয়। এর নতুন সাঙ্কেতিক নাম হয় Echelon Echelon Program-টি এতটাই শক্তিশালী যে এটি যে-কোনো স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশন, ফোন, ই-মেল ট্র্যাক করতে পারে। ২০০৯-এ এই নিয়ে হলিউডে Echelon Conspiracy নামে একটি সিনেমা বের হয়েছে। এই সিনেমার কায়দায় ২০১৩-তে মার্কিন কমপিউটার প্রফেশনাল Edward Snowden বিশ্বজোড়া মার্কিন নজরদারির বিষয়টি সবার কাছে ফাঁস করেন। আর তারপর থেকেই তিনি রাশিয়ায় আশ্রিত। তাঁর দেওয়া তথ্য থেকেই জানা যায় বিশ্বজোড়া চীন ও আরব আগ্রাসন রোখার জন্য কীভাবে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার ১৪টি দেশ মিলিত হয়ে তৈরি করেছে 14 Eyes গ্রুপ (5 Eyes + ডেনমার্ক, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড, নরওয়ে, জার্মানি, বেলজিয়াম, ইটালি, স্পেন, সুইডেন)। স্নোডেনের মতে এই ১৪ চক্ষু গ্রুপের নতুন অফিসিয়াল নাম Sigint Seniors Europe (SSEUR)।

আবার এদিকে চীন হাত ধরছে রাশিয়ার। রাশিয়া টুডের সাম্প্রতিক রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, চীন সফরের সময় রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট পুতিন সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ে চীনের রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। এদিকে আবার রাশিয়ার সব থেকে বড় সাইবার সিকিউরিটি কোম্পানি ‘ক্যাস্পারস্কাই’ সাইবার নিরাপত্তা দেবার জন্য ইন্টারপোল ও ইউরোপোলের সঙ্গে চুক্তি করছে। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রায় শুরু। এবারের যুদ্ধের লক্ষ্য দেশ দখল নয়, বরং সাইবার স্পেস দখল। এই যুদ্ধের অস্ত্র পারমাণবিক বোমা নয়, বরং সাইবার হ্যাকিং। তবে এতে দুই অক্ষ যে কোন কোন দেশ নিয়ে কীভাবে হবে সেটাই শুধু সময়ের অপেক্ষা। আর আমাদের সতর্ক থাকতে হবে চীনা ড্রাগনের থেকে। গড়ে তুলতে হবে জনসচেতনতা যাতে ভারতের মানুষ চীনা দ্রব্য ব্যবহার থেকে শত যোজন দূরে থাকে। দিকে দিকে গড়ে তুলতে হবে চীনা দ্রব্য বর্জন আন্দোলন। জনমানসে জাগাতে হবে স্বদেশ প্রীতি।

DAS STEEL UDDYOG

Naldubi, Mangalbari, Po.+Dist. : Malda

সকল প্রকার স্টীল ফার্ণিচার,
গ্রীলগেট এবং ফেব্রিকেশনের
কাজ করা হয়

Show Room

—ঃ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—

GEETANJALI FURNITURE

Jhaljhalia, Station Road, Malda

Phone : 03512-266063,

Mobile : 9733387091

Ori Plast

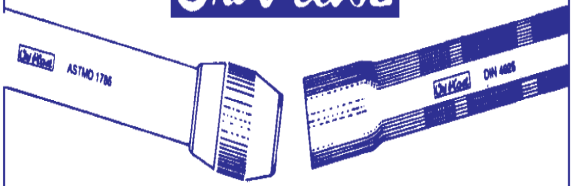

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833

3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

"ভারতে ধর্ম চিরকাল জাতীয় জাগরণের পূর্ববর্তী কারণ হয়েছে। ধর্মের যে তরঙ্গে আচার্য শঙ্কর সমগ্র দেশকে প্লাবিত করেছিলেন, সেই তরঙ্গই বাংলায় চৈতন্যদেবের মধ্যে মূর্ত হয়েছিল, পাঞ্জাবে অনুপ্রাণিত করেছিল শিক বীরদের, মহারাষ্ট্রে ছত্রপতি শিবাজীকে এবং দক্ষিণ ভারতে রামানুজ ও মধ্বাচার্যকে।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

পুস্তক প্রসঙ্গ

কাব্যরস, শিল্পরস ও ভক্তিরসে পরিপূর্ণ এক অপূর্ব পত্রসাহিত্য

সাধনানন্দ মিশ্র

১৮৯৩ খৃস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো ধর্মমহাসভায় সনাতন হিন্দুধর্মের বিজয়ধ্বজা উড্ডীন করেছিলেন। ঠিক তার ৪০ বছর পরেই ১৯৩০ খৃস্টাব্দে আর একজন মহাপুরুষ চিকাগোর দ্বিতীয় ধর্মমহাসভায় সনাতন হিন্দুধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন— তিনিই ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। তবে স্বামী বিবেকানন্দের মতো ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর নাম ততটা প্রচারিত হয়নি। কিছু ধর্মজগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া বাংলায় তথা ভারতে ব্রহ্মচারীজীর দিগ্বিজয়ের কথা অনেকেই জানেন না বা খবর রাখেন না।

ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজীর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল বঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্ত। বাল্যকাল থেকেই তাঁর অধ্যাত্মজীবন শুরু হয়। পূর্ববঙ্গের ফরিদপুরে শ্রীধাম অঞ্চলে শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের লীলাস্থলীতে এসে প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের শিষ্য শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীর কাছে ত্যাগী ব্রহ্মচারী দীক্ষালাভ করেন। এখানেই তাঁর নাম হয়— মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। শ্রীমহেন্দ্রজীর ইচ্ছায় তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পর পর সংস্কৃত ও দর্শনশাস্ত্রে এম.এ পাশ করেন ১৯৩৩ সালে। সেই বছরই গুরুর নির্দেশে তিনি আমেরিকার চিকাগো শহরে দ্বিতীয় বিশ্বধর্ম সম্মেলন (WORLD FELLOWSHIP OF FAITHS)-এ মহানাম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে ২৯ বছর বয়সে যোগদান করেন। ওখানে দেওয়া তাঁর চারটি ভাষণ থেকে ভারতের অমর আত্মার বাণী স্ফুরিত হয়েছিল। তার পর তিনি সেখানে ছিলেন প্রায় ছয় বছর। এই সময়ের মধ্যে আমেরিকার ৬৩টি শহরে তিনি ৩৫৪টি তাৎক্ষণিক ভাষণ দিয়েছেন ইংরেজিতে। তিনি শ্রীজীব গোস্বামীর দর্শনের উপর গবেষণার জন্য চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে বাধ্যতামূলকভাবে জার্মান ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা করে তাঁর 'থিসিস' জমা দিয়ে তিনি পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ২৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে অতিথিবক্তা হিসাবে

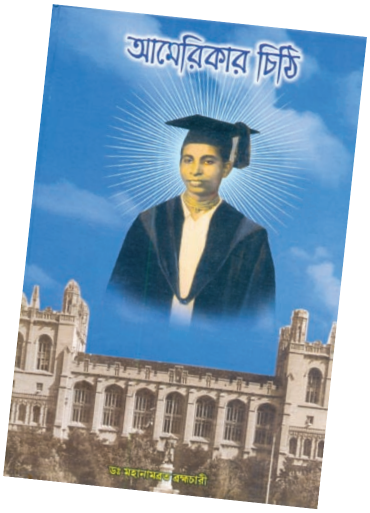

আমন্ত্রণ জানিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল। ছ'বছর আমেরিকা ও বৃটেনে কাটিয়ে তিনি ১৯৩৯ সালে ভারতে ফিরে আসার পর বৃন্দাবন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি সাম্মানিক 'ডি লিট' উপাধি লাভ করেন। আমেরিকা ও বৃটেনে ছয় বৎসর থাকাকালীন তিনি তাঁর গুরু শ্রীমহেন্দ্রজীকে, মহানাম অঙ্গনের বন্ধু ও স্নেহের ছাত্রদের যে সব চিঠি লিখেছিলেন, সেরূপ ৯১টি চিঠি সঙ্কলিত হয়ে 'আমেরিকার চিঠি' নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। দীর্ঘ প্রায় ছয় বৎসরকাল ভারতবর্ষ থেকে সুদূর আমেরিকার ১৫ হাজার কিলোমিটার দূর থেকে তিনি তাঁর গুরুদেব শ্রীমহেন্দ্রজীকে 'প্রাণের দাদা' সম্বোধন করে, শ্রীধাম মহানাম অঙ্গনের আশ্রমবাসী বন্ধুভাইদের প্রত্যেককে সম্বোধন করে লেখা চিঠিগুলিতে তাঁর রঙ্গরস, ছোটদের প্রতি উপদেশ ও স্নেহ, বিদেশের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, ভগবদ্‌ভক্তি, গুরুভক্তি ও অধ্যাত্মবিষয়ে বহু আলোচনা ওইসব পত্রের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর এই পত্রগুলি কাব্যরস, শিল্পরস, ভক্তিরসে পরিপূর্ণ হয়ে এক অপূর্ব পত্রসাহিত্য সৃষ্টি করেছে। সহজ সরল ও সাবলীল ভাষায় তিনি জটিল আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি পরিস্ফুট করেছেন। সর্বোপরি তাঁর বৈষ্ণবজনোচিত বিনয় ও নম্রতা, স্বদেশপ্রীতি, ভালোবাসা ও আন্তরিকতার প্রকাশ ঘটেছে এই পত্রগুলিতে। অনেক পত্রসহিত্যের মধ্যে এটি একটি অনন্য সংযোজন। তাঁর রচিত বহু গ্রন্থাবলীতে তাঁর অভূতপূর্ব মনীষা ও ভারতের সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে অগাধ পাণ্ডিত্য প্রকাশ পেয়েছে। মহামহোপাধ্যায় ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী প্রেরিত এই আমেরিকার চিঠির মাধ্যমে বহু গবেষক তাঁর সত্যকারের পরিচয় পেতে পারবেন। তিনি শুধুই বক্তৃতা করেননি, আমেরিকা যাত্রার আগে ১৪ বছর ভারতে তাঁর গুরুর আশ্রমে থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে সাধন ভজন ও নিজে আচরণ করে লোকশিক্ষা দিয়ে গেছেন। বহু পরিশ্রম ও কষ্টসাধ্য কাজ করে 'আমেরিকার চিঠি' বইটি সঙ্কলন ও প্রকাশ করেছেন ব্রহ্মচারীজীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীমহানামব্রত কালচারাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের পক্ষে তাঁরই শিষ্য ও মহানাম সম্প্রদায়ের সম্পাদক শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী। সনাতন ধর্মকে জানতে হলে প্রতিটি ধর্মপ্রাণ হিন্দুর এই বইটি অবশ্যপাঠ্য।

'আমেরিকার চিঠি'। ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। প্রকাশক : শ্রীমহানামব্রত কালচারাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট। শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গন, রঘুনাথপুর (বাগুইআটি)। ভি আই পি রোড, কলকাতা- ৭০০০৫৯। মূল্য : ৮০ টাকা মাত্র। ■

সমাবেশ সমাচার

ব্যাঙ্গালুরুতে শ্রীশ্রীকালীপূজা

বাংলার পাশাপাশি বিজ্ঞান নগরী ব্যাঙ্গালুরুতেও এবার কালীপূজার আয়োজন করে সেখানকার বাঙালি সমাজ। ২৩ অক্টোবর থেকে ২৬ অক্টোবর চারদিন ব্যাপী পূজার্চনা এস এস সি কল্যাণ মণ্ডপে অনুষ্ঠিত হয়। এই পূজার উদ্যোক্তা মূলত 'ইন্টারন্যাশনাল ইনটেলেকচুয়েল ফোরাম অফ বেঙ্গলি হিন্দুজ'। এই পূজায় ব্যাঙ্গালুরুতে বসবাসকারী বাঙালি হিন্দুদের একত্রিত করাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। ২৩ অক্টোবর পূজার উদ্বোধন করেন দক্ষিণ ব্যাঙ্গালুরুর বিধায়ক এস. কৃষ্ণাপ্পা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কর্ণাটকের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রান্ত কার্যবাহ এন. থিপ্পেস্বামী। এছাড়া বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এম. সুরেশ-সহ অনেকে। বিধায়ক কৃষ্ণাপ্পা প্রদীপ প্রজ্বলন করে পূজার উদ্বোধন করেন। সেই সঙ্গে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'স্বচ্ছ ভারত' অভিযানে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান। আবার এন. থিপ্পেস্বামী বলেন, বাংলা ভারতের মডেল। তবে অভিযোগের সুরে তিনি জানান ৪০ বছর ধরে বাংলায় সেভাবে কোনো উন্নতি হয়নি। তাই শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুদের এগিয়ে এসে তা করে দেখাতে হবে। সেইসঙ্গে তিনি আই আই বি এইচ-দের এই প্রয়াসকে স্বাগত জানান। চারদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে খিচুড়ি প্রসাদের পাশাপাশি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মসূচি এবং প্রতিযোগিতামূলক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

শোকসংবাদ

বাঁশদ্রোণী শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক যোগেশচন্দ্র দে দীর্ঘ রোগ ভোগের পর গত ৪ নভেম্বর রাত্রে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। শরণার্থী, অনুপ্রবেশ ও হিন্দুত্ব বিষয়ে প্রেরণাদায়ী অনেক প্রবন্ধ ও পুস্তিকা তিনি লিখেছেন। উল্লেখ্য, তিনি স্বস্তিকা পত্রিকার নিয়মিত পাঠক ছিলেন।

***

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির সেবিকা তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জলপাইগুড়ি জেলা সম্পর্ক প্রমুখ চন্দন রায়ের ধর্মপত্নী তপতী রায় গত ৮ নভেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। জব্বলপুরে 'সক্ষম'-এর সাংগঠনিক বৈঠকের জন্য চন্দন রায়ের সঙ্গে তিনিও গিয়েছিলেন। ট্রেনেই তিনি আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৮ বছর। তিনি স্বামী, ১ কন্যা ও ১ পুত্র রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তাঁর কন্যা চিন্ময়ী বিদার্থী পরিষদের কর্মী এবং পুত্র গৈরিক স্বয়ংসেবক।

ছটপূজায় স্বাস্থ্য পরিষেবা শিবির

পুরুলিয়া শহরে ছটপূজা উপলক্ষে স্থানীয় মানুষদের বিশাল মেলা বসে পুরুলিয়া সাহেব বাঁধের পাড়ে। সেখানে বিভিন্ন রাজ্য থেকেও পুণ্যার্থীরা উপস্থিত হন। পুণ্যার্থীরা নিষ্ঠা ও ভক্তি সহকারে দু'দিন উপবাস থেকে সূর্যদেবের উদ্দেশে অর্ঘ্য দান করেন। সেখানে পুণ্যার্থীদের তাৎক্ষণিক চিকিৎসার জন্য 'আদ্রানগর সেবা ভারতী'র পক্ষ থেকে ছটপূজা কমিটির অনুরোধে স্বাস্থ্য পরিষেবা শিবির করা হয়। গত ২৯ নভেম্বর বিকালে ও ৩০ নভেম্বর সকাল ৭টা পর্যন্ত স্থানীয় চিকিৎসক ও সেবা ভারতীর কর্মীরা ঔষধপত্র নিয়ে উপস্থিত থেকে প্রয়োজন মতো সেবা করেন।

পুরুলিয়ায় চিকিৎসাকেন্দ্র উদ্বোধন

পুরুলিয়া শহরে 'আদ্রানগর সেবা ভারতী'র উদ্যোগে ১৮ সেপ্টেম্বর সমাজের গরিব মানুষের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য একটি চিকিৎসা কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আর এস এসের বিভাগ সঙ্ঘচালক অসিত দে প্রদীপ প্রজ্বলন ও ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সহ-সেবা প্রমুখ ধনঞ্জয় ঘোষ। সভায় ভারতমাতার পূজা করে চিকিৎসার কেন্দ্রের শুভ সূচনা করা হয়। চিকিৎসা কেন্দ্রে পরিষেবা দেওয়ার জন্য উপস্থিত ছিলেন ডাঃ বন্ধন ভগৎ, ডাঃ নিবাস মাহাত, ডাঃ শঙ্কর কাশ্যপ এবং দন্ত চিকিৎসক ডাঃ সোমদীপ সাহা। ডাক্তারবাবুরা সপ্তাহে ২ দিন সময় দেবেন বলে কথা দেন। এদিন প্রায় ৪০ জন রোগী এই কেন্দ্রে চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রাদি পেয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীকে প্রাথমিক শিক্ষকদের স্মারকলিপি

সারা দেশে প্রাথমিক শিক্ষকদের একই বেতনক্রম ও একই রকম শিক্ষাব্যবস্থা-সহ ১৯ দফা দাবিতে গত ৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ অনুমোদিত বিভিন্ন শিক্ষক সঙ্ঘের সঙ্গে একই দিনেই পুরুলিয়া জেলাতেও জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী, মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে পাঠানোর জন্য জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শককে একটি স্মারকলিপি জমা দিয়েছে বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের জেলা শাখা। সঙ্ঘের জেলা সভাপতি পার্থ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, এদিন শিক্ষকদের বকেয়া ৪৯ শতাংশ মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদান, পাঁচ বছর চাকরি করার পর বিভাগীয় পদোন্নতি, পাঠক্রমে ভারতীয় সংস্কৃতিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় তুলে ধরার দাবি জানানো হয়েছে। সভাপতির সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা কমিটির সৌম্যশঙ্খ ওঝা, নয়নতারা মাঝি, রাজেশ নন্দী, সমীর গোস্বামী, সন্দীপ মণ্ডল, হারাধন দুবে প্রমুখ। শিক্ষক সঙ্ঘের সদস্যদের আশা তাঁদের দাবিগুলি গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা হবে।

বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান

সমাজ সেবা ভারতী অনুমোদিত 'আদ্রানগর সেবা ভারতী' জেলাসদর কার্যালয় খেজুরিয়া ডাঙ্গা, পুরুলিয়ার উদ্যোগে দুর্গাপূজা উপলক্ষে দুঃস্থ ও অসহায় শিশুদের নতুন জামা-কাপড় বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি নাথু মাহাত সভাপতি রূপে উপস্থিত ছিলেন। যমুনাডি কুষ্ঠ আবাসনের প্রায় ১০ জন এবং স্থানীয় বস্তি এলাকার আরও ৩০ জন মোট ৪০ জন শিশুর হাতে পুজোর নতুন পোশাক তুলে দেওয়া হয়। সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিভাগ সঙ্ঘচালক, পুরুলিয়া জেলা সঙ্ঘচালক, নগর সঙ্ঘচালক, পুরুলিয়া জেলা সেবা প্রমুখ শঙ্কর কাশ্যপ এবং আরও অনেক সমাজসেবী উপস্থিত ছিলেন। পুরুলিয়া জেলা সেবা ভারতীর জেলা সম্পাদক সুনীল চন্দ্র কর বলেন, 'সেবার জন্য এবং সমাজের ভালো করার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয় না। কেবল সেবার মনোভাব থাকলেই সমাজের সেবা করা যায়'। সভাপতি মহাশয় আশা প্রকাশ করেন যে আজ যারা পোশাক পাচ্ছে আগামী দিনে উপার্জনক্ষম হলে তারাও যেন সমাজে সেবা করতে পারে। উল্লেখ্য, পুরুলিয়া শহরের কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তি বিতরণের জন্য নতুন পোশাক দান করেন। তাঁদেরকে সেবা ভারতীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

থাকে যদি
'ডাটা',
জমে যায় রান্নাটা
ডাটা®
গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়
DUTA
50g
TURMERIC
FRESH N' PURE POWDER
কেনার সময় অবশ্যই
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী)
প্রাইভেট লিমিটেড
নাম দেখে তবেই কিনবেন
CHILLI
POWDER
Kasuri Methi
pure
INDIAN
SPICES
Krishna Chandra Dutta
(Cookme) Pvt. Ltd.
207 Maharshi Debendra Road,
Kolkata 700007
email : dutaspice@gmail.com

ছোটদের থিয়েটার

বিকাশ ভট্টাচার্য

বেশ কিছুদিন আগে একটা খবর চোখে পড়েছিল। সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সি বি আই ই) একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে ঐচ্ছিক বিষয় রূপে থিয়েটারকে সংযুক্ত করেছে সিলেবাসে। এই বিষয়ে মোট একশ' নম্বরের মধ্যে ৭০ নম্বরের থিওরি ও ৩০ নম্বরের মৌখিক ও পারফরমেন্স থাকবে। পাঠ্য বিষয়ে থাকছে থিয়েটার সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা, থিয়েটারের ইতিহাস, থিয়েটারের মঞ্চ-আলো-বেশভূষা-রূপসজ্জা, ভারতীয় ও প্রতীচ্যের থিয়েটার, বিদেশি থিয়েটার। ভারতীয় নাট্যকারদের মধ্যে যাঁদের নাটক পঠন-পাঠনের জন্য নেওয়া হয়েছে তারা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভরতেন্দু হরিশ্চন্দ্র, বিজয় তেন্ডুলকর, মোহন রাকেশ, ধরমবীর ভারতী, বাদল সরকার, শঙ্কর ঘোষ, গিরিশ কারনাড ও চন্দ্রশেখর কামবার।

এতো গেল সি বি এস ই বা ইংরাজিমাধ্যম স্কুলের কথা। এ রাজ্যের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে (বেশিরভাগই দিল্লী বোর্ডের) রীতিমতো নাটকের চর্চা হয়। কিন্তু বাংলামাধ্যম স্কুলে এসব ব্যাপারে কোনো আগ্রহই নেই। নেই কোনো পরিকল্পনা। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদ বা উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পর্যদ এ ব্যাপারে চুপ। অথচ বেশ কিছুদিন আমাদের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন একজন নাট্যব্যক্তিত্ব। তিনিও এ ব্যাপারে কিছু ভেবেছেন বলে মনে হয় না। অথচ ছোটরা যখন বেড়ে ওঠে, সেইসময়েই সঙ্গীত, আবৃত্তি, নাটক বিষয়ে আগ্রহ বা রুচিবোধ গড়ে না তুললে পরে আর হয়ে ওঠে না। বাংলামাধ্যম স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা যে নাটক করে না তা নয়। তবে সেটা ওই রবীন্দ্রজয়ন্তী, নববর্ষ উৎসব বা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য ১০-১৫ দিন রিহার্সাল দিয়ে নাটক করা বা অন্য কোনো স্কুল আয়োজিত প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য। কোনো নিয়মিত চর্চা বা নাটক নিয়ে আলোচনা কোথাও হয় বলে আমার জানা নেই। পাঠ্যপুস্তকের ভারে নুয়ে পড়া আমার আপনার বাড়ির ছেলেমেয়েদের অন্যদিকে তাকানোর সুযোগ নেই বললেই চলে। দুঃখের বিষয়, এ রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিল্প সংস্কৃতি বিষয়ে আগ্রহ বা রুচিবোধ গড়ে তোলার ব্যবস্থা নেই।

ভারত সরকারের সংস্কৃতি দপ্তর ‘কালচার অ্যান্ড ভ্যালু ইন এডুকেশন’ নামে একটা স্কিমের মাধ্যমে বিভিন্ন নাট্যদলকে গ্রান্ট দিত। এই গ্রান্ট পাওয়ার ফলে বেশ কিছু নাট্যদল ছোটদের নিয়ে নাটকের কাজ শুরু করেন।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই নাম করতে হয় নান্দীকার-এর। এঁরা স্ট্রিট চিলড্রেন, স্লাম চিলড্রেন, সমাজের দূরতম অংশের ফিজিক্যালি ও মেন্টালি রিটার্ডেড ছোটদের নিয়ে কাজ করেছেন। কিন্তু সরকারের এই স্কিমটি এখন বন্ধ হওয়ার ফলে আর্থিক সহায়তাও বন্ধ। পথশিশু, বস্তিবাসী শিশু ইত্যাদিদের নিয়ে নান্দীকারের কাজগুলি এখন বন্ধ। তবে প্রতি রবিবার তাঁরা ছোটোদের একটা অনসম্বল চালান— নিজস্ব প্রচেষ্টায়।

এছাড়া ড. তাপস দাসের উদ্যোগে ‘এসো নাটক শিখি’, পিনাকী গুহ-র উদ্যোগে ‘চেতনা কৃষ্টি সংসদ’, আশিস কুমার খাঁ-র প্রচেষ্টায় ‘বিডন স্ট্রিট শুভম’ নাট্যদল ছোটদের নিয়ে কাজ করছে। এঁদের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। এঁরা প্রায় সারা বছরই ছোটদের নিয়ে মেতে আছেন। এই সমস্ত পরিচালকের মতে, ছোটরা সৃজনশীলতায় সবচেয়ে এগিয়ে। ছোটদের কোনো মলিনতা নেই। তবে অসুবিধে হয় অভিভাবকদের নিয়ে। হঠাৎ ছোটদের আসা বন্ধ করেন। বিয়ে, পুজো, উৎসব তো আছেই— সেইসঙ্গে পরীক্ষা। আছে হল পাওয়া না পাওয়া। এ ব্যাপারে বড়দের নাট্যদলের সঙ্গে পাল্লা দিতে হয়। সরকারি বা বেসরকারি যে কোনো হল হোক না— ভাড়া একই। ছোটদের জন্য কোনো ছাড় নেই।

ব্রাজিল আর্জেন্টিনার পাঠক্রমে ছাত্রছাত্রীদের থিয়েটার দেখতে যাওয়ার একটা নির্দিষ্ট দিন থাকে। আমাদের এখানে প্রবেশ অবাধ লিখলেও কোনো গার্জেনই ছেলেমেয়েদের নিয়ে নাটক দেখতে আসেন না। রবিবার বা ছুটির দিন হলেও। ইউরোপ ও আমেরিকা জুড়েই ছোটদের থিয়েটার শেখার ব্যাপারটা আছে। অনেক স্কলারশিপ আছে। কোথাও কোথাও স্পেশাল স্কুল আছে শুধুমাত্র ছোটদের থিয়েটার শেখানোর জন্য।

ব্যক্তিগতভাবে এই প্রতিবেদকের এ ব্যাপারে কিছু অভিজ্ঞতা আছে। সংস্কার ভারতীর মাধ্যমে বেশ কিছু বিদ্যালয়ে গ্রীষ্মাবকাশ বা পূজাবকাশে কর্মশালাভিত্তিক নাট্য প্রযোজনা করার জন্য যোগাযোগ করা হয়েছিল। অনেক স্কুলই বলেছে তাদের স্কুলে এত অ্যাকাডেমিক প্রেশার যে অন্য কোনো দিকে তাকানো যায় না। এছাড়া অনেক স্কুলের নিজেদেরই নানা অ্যাক্টিভিটিজ থাকে। তারপর ছুটির সময় করলে শিক্ষক পাওয়া যাবে না। দারোয়ানও ছুটির সময় কাজ করতে চাইবে না। অর্থাৎ প্রচেষ্টা বিশ বাঁও জলে। তাই একমাত্র সরকার যদি সিলেবাসে থিয়েটার ঢোকায় তাহলেই একমাত্র ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত থিয়েটার চর্চা করতে পারবে।

(তথ্যসূত্র : নাট্য মুখপত্র)

শব্দরূপ-৭২৭ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

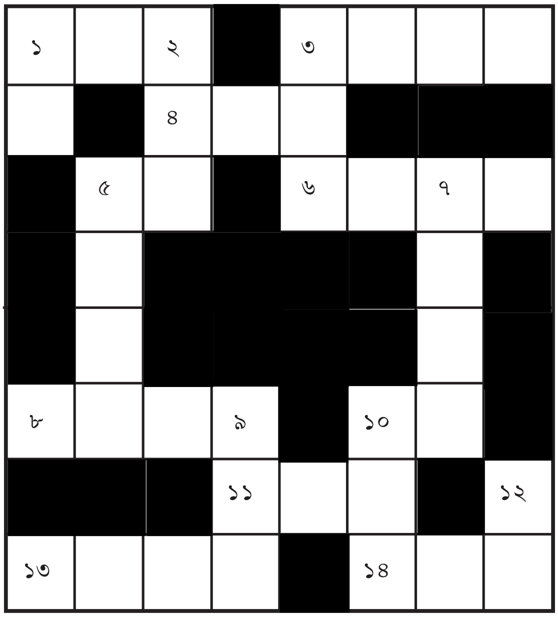

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. পদ্যে লিখিত ইতিবৃত্ত (বৈষ্ণব সাহিত্যে), **৩.** ভীম, **৪.** অশুভঙ্কর গ্রন্থ; অমঙ্গল, **৫.** রাধিকার দূতী ও সখী; তুলসীর নামান্তর, **৬.** তীর্থক্ষেত্রের কাকের তুল্য লোভী ও প্রত্যাশী, **৮.** মহাধনী; শ্রীমন্তের পিতা; কুবের, **১০.** দিবা ও রাত্রির সন্ধিকাল, **১১.** ধারা, শ্রেণী, **১৩.** যে দেশে নদী ও বৃষ্টির জলে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়, **১৪.** কৈলাসের নিকটস্থ তিব্বতের হ্রদ বিশেষ।

উপর-নীচ : ১. এর ইচ্ছায় কর্ম, **২.** একপ্রকার শাক; একে দুয়ে ছুরি, **৩.** ছোট বেগুন, **৫.** কর্ণের পুত্র; অর্জুন কর্তৃক নিহত, **৭.** একগর্ভা, যে একবার মাত্র সন্তান প্রসব করিয়াছে, **৯.** ললাট, বাহু ইত্যাদিতে অঙ্কিত চিহ্ন, ফোঁটা, **১০.** বিভীষণ পত্নী; কুক্কুরী, **১২.** গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের নৃত্যলীলা।

সমাধান
শব্দরূপ-৭২৪
সঠিক উত্তরদাতা

সদানন্দ নন্দী
লাভপুর, বীরভূম
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

		জ	য়	দে	ব		ক
বা	উ	ল			ড়		পি
	প		উ		বা	তু	ল
	নি	ক	ষা			ল	
	য			উ	য	সী	
ম	দ	ন		মা		দা	
ন		হু			বা	স	ন্তী
সা		য	ড়া	ন	ন		

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

 ৭২৭ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৫ ডিসেম্বর ২০১৪ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

SURYA

EVERY CITY EVERY HOME

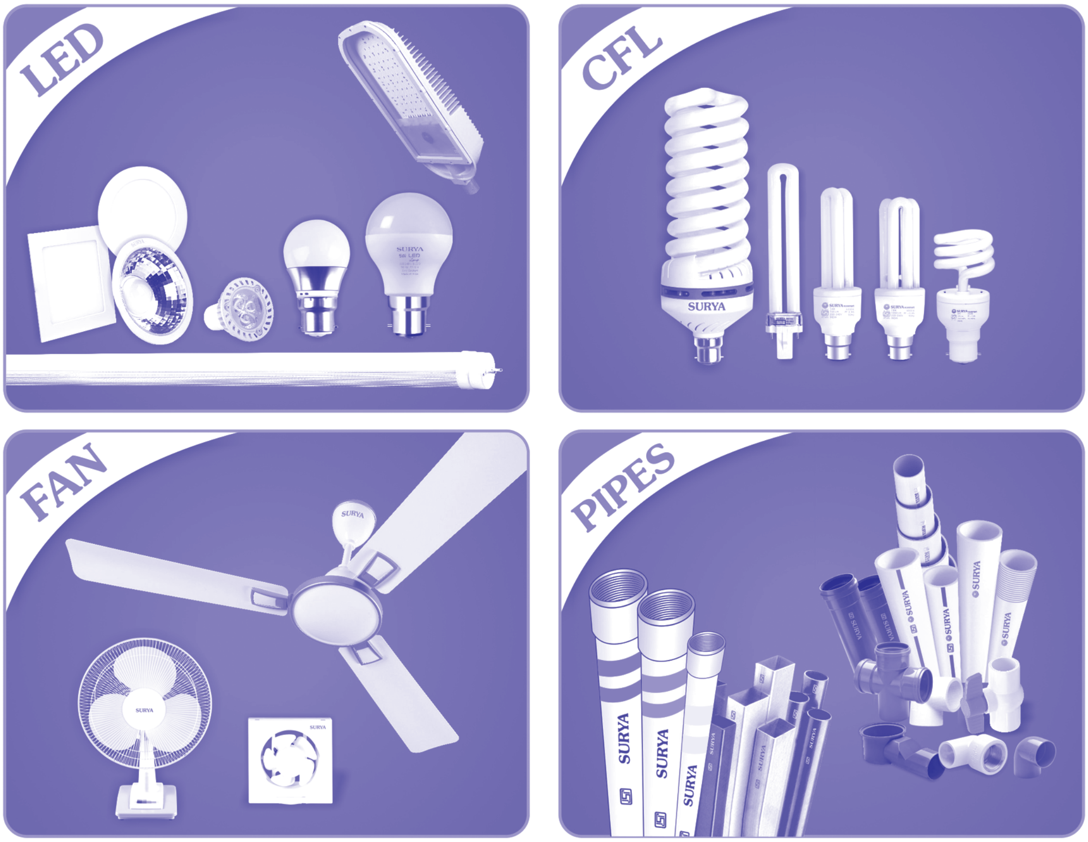

The biggest Indian MultinatiOnal SURYA showcases the best of lighting solutions, unmatched range of fans and quality pipes that touches the live of people from

EVERY CITY EVERY HOME

SURYA ROSHNI LIMITED

Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi-110008 (INDIA)
Tel. : +91-11-25810093-96 Fax : +91-11-25789560
Email : consumercare@sroshni.com Website : www.surya.co.in

হিন্দুত্ব আন্দোলনের পুরোধাপুরুষ একনাথ রানাডে-কে প্রণাম জানালেন প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ হিন্দুত্বের উত্তরাধিকারকে সুরক্ষিত ও স্মরণীয় করে রাখতে সদা তৎপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি বিবেকানন্দ শিলা স্মারকের প্রতিষ্ঠাতা একনাথ রানাডের ভূয়সী প্রশংসা করলেন দিল্লীতে আয়োজিত তাঁর জন্মশতাব্দী সমারোহ অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী সভায়। হিন্দুত্ব ভাবনার পুরোধা অথচ ভিন্ন মতাদর্শের ব্যক্তিত্বদের ভারতীয় চিন্তার মূলস্রোতে নিয়ে আসতে ব্রতী রানাডেকে এক যথার্থ সমাজ সংগঠক বলে অভিহিত করেন প্রধানমন্ত্রী। আজকের দিনের যুব সমাজকে তাঁর কর্মধারা থেকে প্রেরণা নিয়ে জীবনকে কেবল সফল করা নয়, বেঁচে থাকাকে অর্থপূর্ণ অর্থাৎ 'Meaningful'

করার কর্তব্য স্মরণ করান।

একেবারে শৈশবকাল থেকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক রানাডের আসন্ন জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের প্রাক্কালে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রয়াত শ্রী রানাডে আর এস এসের সংবিধান রচনায় মুখ্য ভূমিকা নেওয়ার পাশাপাশি মহাত্মা গান্ধী হত্যার পর উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে আরোপিত সঙ্ঘের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন।

অবশ্য বিশিষ্ট সঙ্ঘ বিশেষজ্ঞদের মতে রানাডের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল সঙ্ঘের মধ্যে বুদ্ধিজীবীদের জন্য একটা স্থান তৈরি করা। বিশেষ করে হিন্দুত্বের আদর্শকে প্রবুদ্ধ শ্রেণীর কাছে গ্রহণীয় করে তোলা, তাঁদেরকে সঙ্ঘের আদর্শের দিকে আকৃষ্ট করা। তাঁর শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে কন্যাকুমারিকায় শেষ শিলাখণ্ডে স্বামীজীর জন্ম শতবর্ষে বিশাল স্মৃতিমন্দির নির্মাণ যা আজ 'বিবেকানন্দ রক' নামে বিশ্বখ্যাত।

উল্লেখ্য, রানাডে প্রস্তাবিত এই বিশাল প্রচেষ্টা তৎকালীন সংস্কৃতি মন্ত্রী হুমায়ুন কবীরের মনঃপুত হয়নি। একটুও না দমে রানাডে সেই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের পক্ষে নয় নয় করে ৩০০ সাংসদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। তাঁর এই প্রচেষ্টায় স্তম্ভিত হয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর প্রস্তাবকে অনুমোদন করেন।

প্রসঙ্গত প্রধানমন্ত্রী তাঁর সদ্য তরুণ প্রচারক জীবনে একনাথজীর কর্মপন্থা চাক্ষুষ করার স্মৃতি রোমন্থন করে জানান— "তাঁর যে কোনো কাজের মধ্যেই ফুটে উঠত একীভূত করে নেওয়ার এক সহজাত প্রচেষ্টা। নানান বিরুদ্ধ মতাদর্শের লোককে অনুপ্রাণিত করায় রানাডে সবসময় বিশ্বাস রাখতেন।" তিনি স্মরণ করিয়ে দেন সেই ৬০-এর দশকে বিবেকানন্দ স্মারক প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে সারা দেশে বিবেকানন্দ ও হিন্দুত্বের ভাবধারা প্রসারিত হতে থাকে। দেশের নানান প্রান্তে সেবা ধর্মের ব্রত নিয়ে গড়ে ওঠে বিবেকানন্দ কেন্দ্র।

জামতলায় গাড়ি চাপা সংকীর্তন দলকে : মৃত ২, আহত ২৩

সংবাদদাতা॥ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগরের অন্তর্গত জালাবেড়িয়ার জামতলা গ্রামের সংকীর্তনে গত তিন বছর ধরে মুসলমান সমাজ বাধা দিয়ে আসছে। দু'বছর আগে ইট ছুঁড়ে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছিল। গত বছর সংকীর্তন চলাকালীন ভাঙচুর চালায়। বিষয়টি নিয়ে থানায় ডায়েরি করা হয়। কিন্তু প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। কিন্তু এ বৎসর গত ৮ নভেম্বর গ্রাম সংকীর্তনকারীদের ওপর এক মুসলমান ড্রাইভার ইটভর্তি লরি উঠিয়ে দেয় এবং আক্রান্তদের উপর আবার ব্যাক গিয়ারে গাড়ি চালায়। তাতে ১ জন তৎক্ষণাৎ মারা যায় ও ২৩ জন গুরুতর আহত হয়। গাড়ির মালিক তৃণমূলের জেলা পরিষদের নেতা সেলিম সাহেব। স্থানীয় হিন্দুদের অভিযোগ, পরিকল্পনা মাফিক সংকীর্তনকারীদের ওপর জেহাদি আক্রমণ করা হয়েছে। কিন্তু পুলিশ প্রশাসন কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। জেহাদিদের এ এক নতুন লাইন বলে স্থানীয় মানুষ মনে করছে। আক্রান্তদের সংকীর্তন করলে এইভাবে মারা হবে বলে ড্রাইভার হুমকি দিয়েছে।

গত ১০ নভেম্বর স্থানীয় হিন্দুরা এর বিরুদ্ধে বনধ্ পালন করে। বনধ্ সম্পূর্ণ সফল হয়। প্রায় ৪ হাজার বৈষ্ণবভক্ত সারাদিন কীর্তন করে পথ পরিক্রমা করে। জামতলা বাজার ব্যবসায়ী সমিতি ভক্তদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে। কার্তিক মাসের শেষ দিনে জামতলার হিন্দুদের উদ্যোগে বৈষ্ণবভক্তদের বিরাট সমাবেশ হবে বলে জানা গেছে।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
17 November - 2014